বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রসঙ্গ

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, এম. এ.,

সাহিত্য ভারতী, ইতিহাস ভারতী, ডিপ্লোমা ইন্ বেসিক এডুকেশন্ ;
অধ্যাপক, সিনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ, বড়সুল, বর্দ্ধমান।

ভারতী বুক স্টল

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলিকাতা—৯।

বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রসঙ্গ

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, এম. এ.,

সাহিত্য ভারতী, ইতিহাস ভারতী, ডিপ্লোমা ইন্ বেসিক এডুকেশন্ ;

অধ্যাপক, সিনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ, বড়সুল, বর্দ্ধমান।

প্রাপ্তিস্থান :

ভারতী বুক স্টল

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলিকাতা—৯।

ছাত্ররা বেশ কর্ম্মঠ, প্রফুল্ল ও আত্মনির্ভরশীল; আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা বেশ ভালো। কাজে সহযোগিতা আছে ও সামাজিক কুসংস্কার দূর হচ্ছে। বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া থানায় ২৭টি বিদ্যালয়ে নীচের বিষয়-গুলি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

শিল্পকাজে শিশুদের নৈপুণ্য ও যোগ্যতা এনেছে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত শৃঙ্খলা এনেছে, তাদের বুদ্ধির বিকাশ যথাযথ হয়েছে। তারা সচেতন ও কর্ম্মঠ হয়েছে। তারা সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে। ভালো কাজে আগ্রহ প্রকাশ করে। শিশুদের কৌতূহল জেগেছে ও তারা প্রশ্ন ক'রে জানতে চায়, তাদের পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা বেড়েছে। শিশু তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে জানতে পারে এবং তার সহযোগিতা ও সেবার মনোভাব জাগে। এছাড়া, দেখা গিয়েছে যে, শিশু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছে। সে যথাযথভাবে জিনিস রাখতে শিখেছে। তার আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা বেড়েছে। ভীরুতা ও লজ্জা দূর হয়েছে। অভিনয়, সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য প্রভৃতি কৃষ্টিমূলক কাজে সে উন্নত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুদের অনেকক্ষেত্রে উন্নত দেখা গিয়েছে।

১৯৪০—৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পাঁচ বছর বুনিয়াদী শিক্ষার অতিশয় সঙ্কটকাল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ভারতবাসীকে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হ'তে হয়। শিক্ষার জন্যে নতুন ক'রে সংগঠনও বাধাপ্রাপ্ত হয়। জাতীয় আন্দোলন বুনিয়াদী শিক্ষার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। বিহার, উড়িষ্যা, কাশ্মীর, বোম্বাই, বাংলা ও মাদ্রাজে কিছু কিছু কাজ হচ্ছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বেসরকারী পরিচালনায় বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি সাময়িকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উড়িষ্যার অনেক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কারামুক্তির পর গান্ধীজী ঘোষণা করলেন—"Basic Education must come literally education for life." গান্ধীজীর এই উক্তির সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পর্ব্বের ইতিহাস শেষ হ'ল। ১৯৪২—৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনে বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে

মেদিনীপুর জেলায় বলরামপুরে, মধ্যপ্রদেশে সেবাগ্রামে, দিল্লীতে জামিয়া মিলিয়া, পুণায় তিলক বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী শিক্ষার রূপায়ণ মন্দগতিতে চলতে থাকে। কারণ, এই সময় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছে।

১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি কর্তৃক শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজ পরীক্ষা করবার জন্যে দুটি সমিতি গঠিত হয়। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এঁরা দেখেছেন এবং বলেছেন যে, ৬—১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক ও আবশ্যিক বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা শিক্ষা সমিতির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদন "সার্জেন্ট পরিকল্পনা" (ভারত সরকারের তদানীন্তন শিক্ষা উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্টের নামানুসারে—১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) নামে পরিচিত। এতে শিল্পমাধ্যম শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের গুরুত্বকে হ্রাস করা হয়।

১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিবেদনের পর প্রাদেশিক সরকার যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনা হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ৮টি প্রদেশে কংগ্রেস পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। তাঁরা কাজ আরম্ভ করেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষাও প্রসারলাভ করে। প্রায় সমস্ত প্রদেশেই বুনিয়াদী শিক্ষা চালু হয় এবং বহু দেশীয় রাজ্যেও ইহা অনুসৃত হ'তে থাকে। কিন্তু এই সময় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও বৃটিশের মধ্যে এমন একটি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখা দিল যে, অন্যান্য সমস্ত গঠনমূলক কাজের প্রতি দৃষ্টি দেবার অবসর কারও আর রইলো না। ফলে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষার অগ্রগতি মন্থর হয়।

খের কমিটি (বোম্বাই সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবি. জি. খেরের নামানুসারে) প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার প্রতিবেদন পেশ করলেন। সার্জেন্ট কমিটি-ও তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার নতুন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। গান্ধীজী বললেন—"The education of everybody at every stage of life." ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সেবাগ্রামে সম্মেলন বসলো। গান্ধীজী বললেন—"Our field is not merely the

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅজিত কুমার সাউ
৭বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৬
মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

মুদ্রক ঃ
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২১১, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

সূচীপত্র

ভূমিকা

সুদীর্ঘ কাল ভারত পরাধীন ছিল। একদিন যে ইংরাজ ব্যবসা করবার জন্যে এদেশে এসেছিল, তারাই পরে কৌশলে শাসক ও শোষক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্য বিপণির একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক লক্ষ্মী সুরঙ্গ পথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে।
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে।"

তখন শাসক-শক্তির স্বার্থানুযায়ী দেশের প্রত্যেকটি বিষয় পরিচালিত হ'ত। দেশের শিক্ষাও তাই সেই সময়ে কিছুসংখ্যক কেরাণী সৃষ্টি করেছিল। মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন—"সেকালে কলিকাতায় বহুসংখ্যক কেরাণী ছিলেন। তাঁহারা কিছুই ইংরাজী জানিতেন না, ইংরাজী জানিলে তাঁহাদের কেরাণীগিরি করিতে হইত না। কেরাণী কেবল 'কপি' করিতেন, আসলে যদি মাছি মরিয়া থাকিত, নকলেও তাঁহারা মাছি মারিয়া রাখিতেন, সেই অবধি মাছি-মারা কেরাণী প্রসিদ্ধি জন্মিয়াছে।"

গান্ধীজী বলেছেন—"ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদের দস্যুর সঙ্গে তুলনা করলেও ভুল করা হয়। কারণ দস্যুরা বল-প্রয়োগে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে, কিন্তু ইংরাজ শাসকরা মনোহরণ ক'রে আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করছে।" সেই শিক্ষা সম্বন্ধে বলা যায় যে, "ইহা চাষীকে চাষের কাজ শিক্ষা দেয়নি, তাঁতীকে তাঁত বুনতে শিক্ষা দেয়নি, যার যা করবার ক্ষমতা ছিল, তাকে তা করবার সুযোগও শিক্ষা দেয়নি, দেশবাসীকে দেশের সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দেয়নি, অথচ চাষীর সন্তানকে 'বাবু' বানিয়ে, তাঁতীকে কেরাণী গড়ে দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।"

প্রচলিত শিক্ষা যে ত্রুটিপূর্ণ, এ-বিষয়ে সকলেই একমত। বলা হয়েছে যে, ইহা জীবনকেন্দ্রিক নয়। ফলে, শিক্ষান্তে ব্যক্তি স্ব-প্রতিষ্ঠ হ'তে পারেনি। সেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ। সেই শিক্ষায় শুধু বই মুখস্থ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। মুখস্থ ক'রে পরীক্ষার খাতায় যে যত ভালভাবে লিখতে পেরেছে, তাকে তত ভালো ছেলে ব'লে মনে করা হয়েছে। এছাড়া, বিষয় বিভাজ্য, কর্ম্মের কোনও স্থান ছিল না, শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়নি, সমাজ-কল্যাণকর কাজে অংশ গ্রহণ করবার মতো উপযুক্ত ক'রে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয়নি, ইত্যাদি। সর্ব্বোপরি, ইহা মানুষকে সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উচ্চ মানবতাবোধের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করেনি। ইহা শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনী-ক্ষমতা ও অন্তরের স্বাভাবিক শক্তি এবং সাহসিকতাকে অনেকাংশে পঙ্গু ক'রে রেখেছে। ইহা খাপছাড়া, অকার্য্যকর, পুঁথিগত, নিশ্চল, বুদ্ধিপ্রধান ও বিদেশী মনোভাবাপন্ন।

শিক্ষাবিদ্‌রা নানাভাবে এই শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করেছেন এবং সিদ্ধান্তও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরিপূর্ণ সাফল্য কোন পদ্ধতিতে দেখা যায়নি। গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা সবদিক থেকেই গ্রহণযোগ্য ব'লে অনেকেই মনে করেন।

এ-কথা ঠিকই যে, পরাধীন ভারতে প্রধানতঃ পরের প্রয়োজনে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, আজ স্বাধীন ভারতে সম্পূর্ণ নিজেদের প্রয়োজনে সে ব্যবস্থা চলতে পারে না। সেই শিক্ষায় আমাদের লাভ সামান্য হ'লেও, লোকসান হয়েছে অনেক। সুতরাং পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিদ্যালয় না গড়ে, আমরা আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষায় ভারতবাসীকে শিক্ষিত করতে চাই। কোন্ শিক্ষা ভারতের আদর্শস্থানীয় হবে, তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

অধ্যাপক হাক্সলি শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন—"আমার বিবেচনায় নিম্ন-লিখিত শিক্ষা যে ব্যক্তি লাভ করেছে, তাকেই সাধারণভাবে শিক্ষিত

ব'লে মনে করবো। সেই ব্যক্তি যৌবনে এমন শিক্ষা পেয়েছে যে, তার শরীর তার মনের অনুচর। যে কাজ করতে সে সক্ষম, তা যেন সে আনন্দে ও দ্বিধাহীনভাবে করে। তার চিন্তাশক্তি যেন পরিষ্কার, মুক্ত ও সর্ব্বসময় কর্ম্মক্ষম হয়। তার মন যেন প্রকৃতির মৌলিক সত্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তার প্রবৃত্তিগুলি তার বিবেক ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির অনুসরণ করে। সে যেন সবরকম নীচতাকে ঘৃণা করতে শেখে এবং অন্যজনকে আপনার মতো জ্ঞান করে। কেবল এই রকম গুণসম্পন্ন লোকই সাধারণভাবে শিক্ষিত আমি মনে করি। কারণ সে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত।" মামুলী শিক্ষা মনুষ্যত্ব গড়ে তোলে না। তাই, শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন হবে, যাতে শুভ ভাব বা চিন্তা পরিণতি লাভ ক'রে মনুষ্যত্ব, চরিত্র ও জীবন গঠনে সহায়তা করে। উপরন্তু, "মাছের পক্ষে সাঁতার-কাটা এবং পাখীর পক্ষে ওড়া যেমন স্বাভাবিক, শিশুর শিক্ষাও তদনুরূপ হবে।"

"মুখে আমরা যা-ই বলি না কেন, মন আমাদের এখনও পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে আছে। পশ্চিম এক সময়ে আমাদের নব-জাগরণে সাহায্য ক'রেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু, আজ পশ্চিম আমাদের মনের খাদ্য যোগাতে পারবে কিনা, তা সন্দেহের বিষয়। বরঞ্চ দেখছি, অনেক বিদেশী শক্তিমান্ লেখক ভারতের উপনিষদে ও যোগশাস্ত্রে জীবনের পাথেয় সন্ধান ক'রতে আরম্ভ ক'রেছেন। যে-দেশের মাটিতে এখনও গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব, মনে রাখতে হবে, তার সম্ভাবনার অন্ত নেই" (প্রমথনাথ বিশী)।

বিবেকানন্দ বলেছেন—"What we want is Western science and technology coupled with Vedanta."

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা বিংশ শতাব্দীর পাদপীঠে উজ্জ্বল সম্ভাবনার যে মুক্ত বেণী বইয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে ভারতের বেদান্ত তথা ধর্ম্মাশ্রয়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক যুক্ত বেণীর সৃষ্টি করতে হবে, রচনা করতে হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয়ে গঙ্গা-যমুনার এক অভূতপূর্ব্ব মহাসঙ্গম। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে যেন আমরা নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে একেবারে বিলিয়ে না দিই।

Sir Philip Hartog বলেছেন—"You have in India the most ancient and the most modern, East and West, combined, as perhaps in no other country in the world, a country in which the tradition of education is perhaps the oldest."

প্রাচীন কাল থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্‌রা নানা মত প্রকাশ করেছেন। যেমন—প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল, কুইন্টিলিয়ান, সেন্ট অগস্টিন, মণ্টেন্‌, কমেনিয়াস, এমার্সন, ডিউই, স্পিনোজা, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, থোরো, ফেনেলঁ, একহার্ট, রুশো, পেস্টালজি, ফ্রোয়েবেল, উস্‌পেনস্কি, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী, রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি।

আইনস্টাইন বলেছেন—"মহাত্মা গান্ধী এ-যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ।" অপরাপর শিক্ষাবিদ্‌দের মতো গান্ধীজীও ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন। "গান্ধী আমাদের ইউরোপীয় বিপ্লবীদের মতো নন। তিনি নব মানবতার জন্মদাতা" (রোমাঁ রোলাঁ)। তিনি জানতেন যে, সত্যিকারের শিক্ষা তা-ই যা দেশের সবচেয়ে বড় ও মৌলিক সমস্যার সমাধানের পথ ব'লে দেয়। রাষ্ট্রের শিশু ও বয়স্ক সকলেরই সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক তৈরির জন্যে, পারস্পরিক সহযোগিতা-মূলক সমাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নঈ তালিম-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। পল্লী-উন্নয়ন, অভাব-পীড়িত অঞ্চলে ক্লেশ-লাঘবকর ও হিতকর কার্য্য প্রবর্ত্তন, রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা, অবৈতনিক শিক্ষাদান, সামাজিক কু-প্রথার নিবারণ ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষার্থীর কর্ম্মশক্তি, শৃঙ্খলাবোধ ও দেশহিতৈষণা জাগিয়ে তোলবার ব্যবস্থা শিক্ষায় থাকবে। আরও স্পষ্ট ক'রে বলা যায় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে "এমন এক সমাজ-গঠন, যার ভিত্তি সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যাতে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ভেদাভেদ থাকবে না, যেখানে সকলের স্বাধীনতার দাবি থাকবে এবং সকলে নিজ নিজ জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হবে এরূপ বিশ্বাস থাকবে।" জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী চিন্তা ক'রে সমাধান হিসাবে এক অভিনব শিক্ষা-

পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন। "এই শিক্ষা-ব্যবস্থা অভূতপূর্ব্ব এবং সমগ্র জীবন ও মানব-সমাজকে নতুন ক'রে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা ; সুতরাং, নতুন সমাজের ভিত্তি বা বনিয়াদ গড়বে ব'লে একে বুনিয়াদী শিক্ষা বা সম্পূর্ণ নতুন কর্ম্মপন্থা ব'লে একে নঈ তালিম বা নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা বলা হয়েছে।" একে মৌলিক, অভিনব, যুগান্তকারী, বৈপ্লবিক প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। গান্ধীজীর সেবাগ্রামে গিয়ে বাস করার ফল এই শিক্ষা-পরিকল্পনা উদ্ভাবন। সেখানকার ছেলেমেয়েদের দেখে গ্রামের অবস্থা বিবেচনা ক'রে তাঁর মনে উদ্ভাসিত হ'ল এ কল্পনা। তাঁর বয়স তখন ৬৭ বছর।

তিনি যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছেন, তা কর্ম্মমাধ্যম শিক্ষা। তিনি বলেছেন—"শিক্ষা অর্থে আমি বুঝি শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তির শরীর, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ। আক্ষরিক জ্ঞান শিক্ষার সমাপ্তি নয়, আরম্ভও নয়। ইহা নর-নারীকে শিক্ষিত করবার বহু পথের একটিমাত্র। আক্ষরিক জ্ঞান নিজে শিক্ষা নয়। প্রয়োজনীয় হস্তশিল্পের দ্বারা আমি শিশুদের শিক্ষা আরম্ভ করতে চাই। এইরূপে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়কে আত্মনির্ভরশীল ক'রে গড়ে তোলা যায় এই শর্ত্তে যে, সেই বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যগুলি রাষ্ট্র কিনে নেবে। মন ও আত্মার সর্ব্বোত্তম বিকাশ এইরকম শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারাই সম্ভব—ইহা আমার মনে হয়। আজকালকার মতো প্রত্যেকটি হস্ত-শিল্প যন্ত্রবৎ শিক্ষা না দিয়ে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ, শিশু সেই শিল্পের প্রত্যেকটি পদ্ধতির কারণ সম্বন্ধে অবহিত হবে। কিছু-মাত্র বিশ্বাসী না হয়ে আমি ইহা বলছি না ; কারণ ইহার পিছনে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে।"

শোষণহীন ও শাসনবিহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে এমন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাতে ছেলেমেয়েদের মন ছোটবেলা থেকে সেভাবে গড়ে উঠতে পারে, তবে তা হয়ে ওঠে সহজ ও স্বাভাবিক। তাই তাঁর সমস্ত আদর্শকে রূপ দেওয়ার জন্যে তিনি উদ্ভাবন করলেন বুনিয়াদী শিক্ষা। এটি তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বা শেষ বাতিক। হাত, পা, কান, চোখ, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা।

আদর্শস্থানীয় শিক্ষায় ব্যক্তির জীবন অবশ্যই সততাপূর্ণ হবে। তাই তিনি হৃদয়ের শিক্ষা এবং আত্মনির্ভরতার শিক্ষার কথা বলেছেন। তাই গান্ধীজী বলেছেন—"আমি এ-কথা পরিষ্কার ক'রে বলতে চাই আমি গ্রামের ছেলেমেয়েদের শুধু হস্তশিল্প বা কারিগরী শিক্ষা দিতে চাই না। আমি তাদের হাতের কাজের মাধ্যমে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতে চাই।"

বুনিয়াদী শিক্ষায় আক্ষরিক জ্ঞানকে মুখ্য ব'লে মনে করা হয় না। সংবাদ-সরবরাহের পরিমাণ দিয়ে জ্ঞান পরিমাপ করা হয় না, জীবনে শিশু কতটুকু পূর্ণতা লাভ করলো, তার ওপর নির্ভর করে। তাই, জীবন যদি সৃজন-ক্ষমতায় পঙ্গু হয়, তাহলে বিদ্যা অগাধ হ'লেও তা পরিপূর্ণ ব'লে গণ্য করা হয় না। বিদ্যা সংবাদ-সংগ্রহের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু জ্ঞানার্জ্জন করতে হ'লে সক্রিয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা দ্বারা নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতার প্রয়োজন।

নঈ তালিমকে বিনোবাজী 'বৈপ্লবিক শিক্ষা' আখ্যায় অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই শিক্ষা সম্পূর্ণ নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই শিক্ষায় জ্ঞান ও কর্ম্মের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থী তার স্বভাবগত প্রবণতা অনুযায়ী একটি বৃত্তিগত কর্ম্মের মধ্য দিয়ে বিদ্যা শিক্ষা করবে। এই বিদ্যা আহরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার কর্ম্মের নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যা ও কর্ম্মের এই সম্পর্ককে তিনি 'সমবায়' বলেছেন। এই সমবায়-সম্পর্কের অনুশীলনে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে ব'লে তাঁর বিশ্বাস। মানুষে মানুষে কোন রকম সামাজিক পার্থক্য নঈ তালিমে নেই। তাই, নঈ তালিম প্রবর্ত্তনের পর ভারতে এক বিরাট সামাজিক বিপ্লব হয়ে যাবে। বাস্তবিকই, পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্যে দরকার ব্যক্তির জীবনে শুচিতা। হৃদয়ের শিক্ষা ও আত্মনির্ভরতার শিক্ষাও এর জন্যে প্রয়োজন। নৈতিক শিক্ষা এর অপরিহার্য্য অঙ্গ হবে। এখনও দেখা যায় যে, শিক্ষাবিদ্‌রা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিকের ওপর জোর দিতে গিয়ে কখনও কখনও নৈতিক শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব দেন না। আধুনিক শিক্ষায় আত্মিক দিকের (spirit) উপেক্ষা দেখা যায়।

তাই, নৈতিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা-ব্যবস্থা হওয়া উচিত, যেখানে হাত এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের চর্চ্চা হবে এবং বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে তা সমাজ ও স্রষ্টার সেবা করবে। "A human personality developed to its maximum spiritual possibilities is the finest thing in life, the noblest work of God."

স্বাধীন ভারতে আজ বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ, ভবিষ্যৎ ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্যে এর আশু প্রচলন প্রয়োজন। "যান্ত্রিক শিক্ষা মানুষের মাংসপেশীতে এক প্রকার নৈপুণ্য দান করে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তার বুদ্ধিকে জাগ্রত করে, কিন্তু একমাত্র উদার শিক্ষার ফলে সমগ্র মানুষ (complete man) গড়া সম্ভব। ......রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দর্শন ও বিজ্ঞানে একপেশে মানুষ সৃষ্ট হয়। আস্ত মানুষ সৃষ্টি সম্ভব সাহিত্যমূলক শিক্ষায়। এখন এই আস্ত মানুষই গণতন্ত্রের সত্যিকার ভিত্তি। সেইজন্যই গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে উদার শিক্ষানীতি নিতান্ত অপরিহার্য্য" (প্রমথনাথ বিশী)।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন যে, আমাদের ভারতের লোকসংখ্যা এত বেশী যে, শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করতে হ'লে তা একমাত্র বুনিয়াদী শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। তা না হ'লে, শিক্ষার বিস্তার হ'লেও বেকার সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আমরা যদি শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন করতে চাই এবং সেই সঙ্গে দেশবাসীর সমৃদ্ধি কামনা করি, তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ও অর্দ্ধাহারী এবং প্রায়-নগ্ন অধিবাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা। "Total man-এর শিক্ষার সঙ্গে আসল যোগ রয়েছে শুধু জ্ঞানের নয়, ধ্যানেরও ; জ্ঞানকে সুবিন্যস্ত ক'রে মানুষ পেয়েছে বিজ্ঞানকে। জ্ঞানকে জ্ঞান-উজ্জ্বল করতে পারলে যা পাওয়া যায় ও হওয়া যায়, তা-ই আসল কথা। এই সত্য-লোকে পথে-চলা মানুষই খাঁটি হয়। 'হিউম্যানিটিস্ কোর্স' খুলে আমেরিকার বইয়ের তালিকা দিলেই সমগ্র মানুষ তৈরি হবে

না। শিক্ষাদাতার বাক্‌চাতুর্য্য, পণ্ডিতম্মন্যতা বিদ্যার্থীর কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্মকে স্পর্শ করে না। 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ।' সর্ব্বত্রই আদর্শবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে বাস্তববাদের এবং বাস্তববাদীরা দলে ভারী। ধনবলে পুষ্ট—তাই, আদর্শবাদীদের আদর্শ প্রায় কেউই শুনছে না" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তন ক'রে নতুন সমাজ-গঠন প্রকৃতপক্ষে এক বিপ্লব। অহিংস পন্থায় গান্ধীজী এই পরিবর্ত্তন চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, একদিন মানুষের অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন হবে। তার জন্যে প্রস্তুতি, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে একটি বিশেষ কর্ম্ম-পদ্ধতির অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। জমিদারী প্রথা আজ স্বাভাবিক নিয়মে ভেঙেছে। কিন্তু, তাদের অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তনের জন্যে এই চাপকে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। এরই নাম বিপ্লব। অভিনব এই শিক্ষা-ব্যবস্থা। জে. বি. কৃপালনী বলেছেন—"A social order based upon the principles excluded all exploitation, economic, social, political or even religious."

বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা জীবনব্যাপী শিক্ষা। সমাজকল্যাণকর সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কর্ম্মকে কেন্দ্র ক'রে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কারণে মূল ও সহযোগী শিল্প শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কাজের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা হয় ব'লে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রাম ও শহর উভয়েরই উপযুক্ত এই শিক্ষা। সর্ব্বোপরি, এই শিক্ষা বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে একটি নিবিড় যোগ স্থাপন করতে চায়, স্বাবলম্বন, সহযোগিতা ও পরিশ্রমের মর্য্যাদাবোধ জাগিয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে একটি গতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্যে সহায়তা করে।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় শিক্ষাকাল ৭ থেকে ১৪ বছর ধার্য্য করা হয়েছে। কিন্তু সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় ইহা ৬ থেকে ১৪ বছর ধরা হয়েছে। শিল্প, সামাজিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া হয়ে থাকে। কাতাই শিল্প ও কৃষিকে এই শিক্ষায় খুব গুরুত্ব দেওয়া

হয়েছে ; এদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানদান সম্ভব। পূর্ব্বের তুলনায় ইংরাজীর জ্ঞান কিছু কম হ'লেও, ম্যাট্রিকুলেশন সমতুল্য ব'লে একে গণ্য করা হয়েছে। শিশু-মনের কৌতূহল ও ঔৎসুক্যকে কাজে লাগাবার দায়িত্ব শিক্ষার। বাস্তবের সঙ্গে যে শিক্ষার যোগ যত বেশী, তার মূল্যও তত বেশী। গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করবার দাবি করতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও এই শিক্ষা ক'রে থাকে। শিশু প্রথম থেকে উপার্জ্জনক্ষম হ'লে উত্তরকালে জাতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারবে। তার আত্মনির্ভরশীলতা দৃঢ় হবে ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে। এছাড়া, শোষণ ও সঞ্চয়ের স্পৃহা তার থাকবে না ব'লেই মনে করা যেতে পারে।

শুধু অধ্যয়নকে আমরা শিক্ষা বলতে পারি না। পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে স্থাপিত সম্বন্ধ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের ব্যবহারের যে পরিবর্তন, তাকে উন্নতির পথে অগ্রসর ক'রে সমাজে তৃপ্তিপূর্ণ এবং সার্থক জীবনযাপনে সাহায্য করে ; তা-ই শিক্ষা। শিক্ষা সৃজনধর্ম্মী। প্রকৃত জ্ঞান অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অভিজ্ঞতাই জ্ঞান এবং জ্ঞান-সঞ্চয়ই শিক্ষা। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের প্রয়াসকেই বলা হয় শিক্ষা। স্বল্পস্থায়ী জৈব জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে প্রকৃতির অনন্তলীলার রহস্য-সন্ধানেরই আর এক নাম শিক্ষা। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জ্ঞান যে-কোনও মানুষের পক্ষে একখানি গ্রন্থবিশেষ। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে জীবনকে অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাধারা বলা যায়। গান্ধীজী স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম উপায়ে শিক্ষাদানের কথা জোর দিয়ে বলেছেন এবং এই কারণেও কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা অনিবার্য্যভাবেই এসে পড়েছে। এই সব কাজ যদি নিষ্প্রাণ না হয়ে আনন্দময় হয়, তাহলে শিশুর যথাযথ চারিত্রিক বিকাশ সম্ভব হবে। ইহা মনোবিজ্ঞান-সম্মত ব'লে সর্ব্বজন-স্বীকৃত। গান্ধীজী বলেছেন—"নঈ তালিমের দ্বারা বুদ্ধি, শরীর ও আত্মার বিকাশ হয়। অপর শিক্ষায় শুধু বুদ্ধিই বাড়ে। নঈ তালিমে আমার দাবি এই যে, এতে বুদ্ধি শোধিত হয় এবং এর সুসমঞ্জস উন্নতি সাধিত

হয় ; আত্মারও খোরাক মেলে। সূতো কাটতে শেখাই সব-কিছু নয়। এতো অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এতে যদি আত্মার বিকাশ না হয়, তবে এ আমাকে পরিত্যাগ করতে হবে।” শিল্পের মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হয় ব’লে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি শিশুর কিছু অবদান থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ইংলণ্ডে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সম্ভব হয়নি। ভারতে শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রথম প্রয়াস দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্’ স্থিতিলাভ করে এবং শিল্পকাজ শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আবার জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ’লে শিল্পও শিক্ষায় স্থান পায়। এর পর ইহা স্থান পায় ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায়। দেশের শিল্পশিক্ষা-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের এক পর্য্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষানীতির স্থান ও দান সামান্য নয়।

নঈ তালিমে শিশু তার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে। অভিভাবকের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। শিক্ষা সমাপ্ত হ’লে শিশু নিজের বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হবে। এছাড়া, বাগানের কাজ, সামুদায়িক কাজ তার অবশ্য-করণীয় হবে এবং সে অন্ততঃ আংশিক স্বাবলম্বী হবে। এইভাবে সে শান্ত পারিবারিক জীবন যাপন করতে পারবে এবং জীবনকেও মধুময় ক’রে তুলবে।

এক কথায় বলা যায় যে, “চরিত্রের ও শিক্ষার যে সমস্ত গুণ থাকলে মানুষ জীবন-সংগ্রামে তলিয়ে যায় না, বুদ্ধি—অভিজ্ঞতার নিকট যে বুদ্ধি ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে, রুচি—সঙ্গীত, চিত্র ও নৃত্যকলার ভিতর দিয়ে যে সৌন্দর্য্যবোধ ও রুচি গড়ে উঠেছে, সামাজিকতা—অপরের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতির সঙ্গে যে সামাজিকতা গৃহ, গোষ্ঠী এমনকি রাষ্ট্রের গণ্ডি ছাপিয়ে সমস্ত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, সংযম—যে সংযম প্রতি পদে অসৎ প্রবৃত্তি দমন করে, স্বার্থকে গোষ্ঠী বা দশের কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করে, ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে মানুষের জীবনে, ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম বিকশিত হয়ে ওঠে দৈনদিন জীবনের শান্ত, শুদ্ধ, পুণ্যময় প্রতিটি আচরণে ও স্বাস্থ্য—নিয়মিত মাংসপেশী চালনায় ও চারু দেহভঙ্গীতে যে স্বাস্থ্য হয়ে ওঠে

দীপ্তিমান, ভাস্বর এবং সর্ব্বশেষে, যে বৃত্তি কর্ম্মকুশলতার ভিতর দিয়ে এনে দেয় মুখের অন্ন, দেহের বস্ত্র, নিরাশ্রয়তার আশ্রয়-গৃহ—সে সমস্ত গুণাবলীর আদর্শ” বহু শতাব্দী পরে আজ নঈ তালিমে স্থান পেয়েছে (ক্ষেত্রপালদাস ঘোষ)।

আত্মা-বিশ্বাসী ব'লেই গান্ধীজী আত্ম-বিশ্বাসী। জগৎ ও জীবনের সমুদয় সমস্যাকে তিনি ভিতরের দিক থেকে স্পর্শ করতে চান। সম্ভব হ'লে সমাধান করতে চেষ্টা করেন। এই অন্তর্লোকের বাণীকেই তিনি ব'লে থাকেন 'Inner Voice'. অন্তরের দিক থেকে বাইরের দিকে তাঁর গতি ব'লেই প্রেমের দ্বারা অন্তরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে সমস্যা সমাধান তাঁর পন্থা। এযুগের বহু-ঘোষিত 'Objective condition'-এর গান্ধী-আবিষ্কৃত প্রতিষেধক 'Subjective condition'. দৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটলে জগৎ পরিবর্ত্তিত হয়, অন্তরের পরিবর্ত্তনে দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত। বস্ত্রদীন ভারত, তপঃকৃশ ভারত, অর্দ্ধনগ্ন ভারত, ক্ষুৎকাম দৃঢ়সঙ্কল্প ভারত, চলমান ভারত, বদ্ধদৃষ্টি ভারত, উন্নতললাট ভারত—সমস্তই প্রতিফলিত গান্ধী-মূর্ত্তিতে। ভারতের আকাশে যে প্রশান্ত বিষাদ, ভারতের সাধনায় যে অমেয় মৈত্র, ভারতের হিমাচলে যে অটল মহিমা, গান্ধীজীর নেত্রে, ওষ্ঠাধরে ও বক্ষোপটে তা প্রকাশিত।

পরিশেষে, গান্ধীজী-পরিকল্পিত ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় অভিনবত্ব এবং বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে আছে। কিন্তু তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষাবিদ্‌দের শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে এই শিক্ষানীতির কোন-না-কোন ক্ষেত্রে যেমন কিছু মিল আছে, তেমনি পার্থক্যও আছে।

গান্ধীজীর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, গুরুকুল। এছাড়া ছিল—রুশো, পেস্টালজি, ফ্রোয়েবেল, মণ্টেসরী পদ্ধতি, ডল্টন পদ্ধতি, হিউরিস্‌টিক পদ্ধতি ইত্যাদি।

রুশোর মতো গান্ধীজী অতি সাধারণ জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রুশোর নীতি সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ; গান্ধীজী সমাজ-জীবনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং শিক্ষার্থী সমাজ-জীবনে প্রবেশ ক'রে সামাজিক জীবনধারায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে।

continue

পেস্টালজির মতো গান্ধীজী শিক্ষার্থীকে একজন কর্ম্মী-নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু পেস্টালজির শিক্ষাদর্শ যেমন মনস্তত্ত্বের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, গান্ধীজী মনোবিজ্ঞানের ওপর তত জোর দেননি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, গান্ধীজী শিল্পকাজের জন্যে যে সময়ের কথা বলেছেন, তা নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে; অবশ্য গান্ধীজীও এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন।

মণ্টেসরী এক জায়গায় বলেছেন যে, শিশুদের শেখাবার প্রধান বাহন হবে তাদের স্বাভাবিক কাজের প্রেরণা। গান্ধীজীও এই মত পোষণ করতেন। কিন্তু মণ্টেসরী খেলাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। গান্ধীজী স্বাবলম্বনের ওপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, স্বাবলম্বনকে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা যাচাইয়ের কষ্টিপাথর মনে করতেন। তাই খেলার প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না, উৎপাদনাত্মক কাজ ছিল তাঁর খুব প্রিয়।

ফ্রোয়েবেল ও হার্ব্বার্ট তাঁদের শিক্ষাদর্শে নৈতিক ভিত্তির ওপর জোর দিয়েছেন। গান্ধীজী এঁদের মতো অত অনুরক্ত ছিলেন না।

ডিউই আধুনিক কালের একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্। তাঁর চিন্তাধারা ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর শিক্ষানীতি ব্যক্তিকে অতিক্রম ক'রে সমাজ-জীবনকে অত্যধিক মূল্য দিয়েছে। তিনি বলেছেন যে, ভবিষ্যতে সমাজ-জীবন যাপন করবার জন্যে যে অভিজ্ঞতার দরকার হবে, বিদ্যালয়ে শিশু সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান-লাভ করবে। গান্ধীজীও তাঁর শিক্ষাদর্শে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। উভয়েরই মত হ'ল—বিদ্যালয় সামাজিক জীবনের অঙ্গস্বরূপ কাজ করবে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীন আদর্শের পূজারী ছিলেন। তপোবনের শিক্ষা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই, প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আশ্রমিক শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন। গান্ধীজীও আশ্রম-জীবন যাপনের কথা বললেও, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। তিনি মনে করতেন যে, লোকালয় বা সমাজ থেকে দূরে বিচ্ছিন্নাবস্থায় আশ্রম না গড়ে, প্রতিটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে আশ্রম ক'রে তুলতে হবে।

আশ্রমের রূপ সম্বন্ধে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে সুকুমার কলা প্রিয় ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে তা ছিল গৌণ। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যে একটি আত্মিক যোগ রয়েছে, এ-কথা গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় তাই তিনি সমাজ-ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখের 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী সর্ব্বপ্রথম নঈ তালিমের কথা প্রকাশ করেন। ঐ বছর ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধায় মারোয়াড়ী এডুকেশন সোসাইটি'র (বর্ত্তমানে নব ভারত বিদ্যালয়) রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শিক্ষা-সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রথম জাতীয় শিক্ষার অধিবেশনে গান্ধীজী ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা পেশ করেন। ঐ সভার সভাপতি হয়েছিলেন গান্ধীজী।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস আটটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। বিহার, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করেন। এঁরা কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন প্রদেশে কাজ আরম্ভ হয়। তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহে বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। বিহার ও উত্তর প্রদেশে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা-প্রসারের কাজ সুরু হ'ল। বিহারের চম্পারণ জেলায় অনেক বিদ্যালয়ে কাজ আরম্ভ হ'ল। কাশ্মীরেও ভালো কাজ হ'ল। অন্যভাবেও কাজ হ'তে থাকে; যেমন— জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া। বাংলায় কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ সুরু হয়নি।

আলোচনার পর চারটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল—

(১) সাত বৎসরব্যাপী সার্ব্বজনীন অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা দিতে হবে।

(২) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

(৩) শিশুর পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিল্পমাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

(৪) শিক্ষকের বেতন উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী ক'রে হবে।

ডক্টর জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে এক সমিতি গঠিত হ'ল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সমিতি অধিবেশনের চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদন (Report) দিলেন।

প্রথম তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট—

(১) একটি মূল শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান চলবে এবং শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে।

(২) শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে—শিক্ষকের বেতন শিক্ষার্থীর তৈরী জিনিস বিক্রী ক'রে পাওয়া যাবে।

(৩) এই শিক্ষায় দৈহিক শ্রম থাকবে এবং তার ফলে শ্রমের প্রতি মর্য্যাদাবোধ জাগবে।

(৪) যে বিষয় শিশুকে শেখানো হবে, তা যেন তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়।

(৫) শিশুদের সুনাগরিক হবার শিক্ষা দিতে হবে।

পাঠ্যক্রম—

(১) শিক্ষাকাল ৭—১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত হবে। শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক হবে।

(২) যে-কোন একটি শিল্প—বস্ত্রবিদ্যা, দারুশিল্প, ফল ও সব্জি চাষ, কৃষিকাজ, চর্ম্মশিল্প, শিক্ষা-সম্ভাবনাযুক্ত যে-কোন গ্রামীণ শিল্প।

(৩) কাতাইয়ের প্রাথমিক জ্ঞান।

(৪) গণিত, সমাজ-বিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কন, সঙ্গীত, হিন্দুস্তানী ভাষা।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষার কার্য্যক্রম-স্বরূপ গ্রহণ করা হয় এবং এপ্রিল মাসে মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধার কাছে সেবাগ্রামে হিন্দুস্তানী তালিমী

সংঘ গঠিত হ'ল, আর শিক্ষক-শিক্ষণের জন্যে ওয়ার্দ্ধায় প্রথম কেন্দ্র খোলা হ'ল।

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন-ব্যাপারে ক্ষমতালাভের পর দেশবাসী অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি জানান। এই কাজ নিঃসন্দেহে ব্যয়সাধ্য। সঙ্কট হ'ল এই যে, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন করতে গেলে আয় অনেক কমে যায়, তার ফলে শিক্ষার ব্যয় কমে, অথচ তা অব্যাহত রেখে শিক্ষা চলে না। তাই গান্ধীজী এই সঙ্কট উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন গান্ধীজী রুশ সাহিত্যিক ও সমাজসেবক মহামতি টলস্টয়ের প্রতি অনুরক্ত হন। টলস্টয়ের লেখা—'The Kingdom Of God Is Within You' গ্রন্থখানি গান্ধীজীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। গান্ধীজী তাঁর নামে 'টলস্টয় ফার্ম্ম' প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং কৃষিকাজ, রন্ধন, কাপড়-কাচা ইত্যাদি সব কাজ করতেন। ঐ সময় রাস্কিনের লেখা "Unto The Last" বইখানি পড়ে গান্ধীজীর মনে সর্ব্বোদয়ের ধারণা জন্মাতে থাকে। "ফিনিক্স আশ্রম" নামে আর একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। শিশুদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, শিশুরা কাজ করতে আনন্দ পায়। কাজ না হ'লে তারা থাকতে পারে না। এই পরীক্ষা-সিদ্ধ ধারণা তাঁকে কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনে প্রণোদিত করে। কাজ করলে পড়ার ক্ষতি হয় না, নতুন এক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। শিশুরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা বেশী স্থায়ী হয়। তাছাড়া, শিক্ষার জন্যে যে ব্যয়, তা বহন করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে তিনি ভারতে আসেন। সবরমতীতে (আমেদাবাদ) তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। "হরিজন" পত্রিকার স্তম্ভে যা তিনি অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবার প্রয়াস করেছেন, তা আকস্মিক দীপ্তি-স্বরূপ তাঁর অন্তরে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তার সত্যতা তিনি দিন দিন অধিকতর উপলব্ধি করেছেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচনায় দেখা যায় যে, সরকার, স্থানীয় সমিতি ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় পরিচালিত বিদ্যালয়ে কাজ চলেছে। ছেলেদের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া ও আচরণ বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের

(২) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

(৩) শিশুর পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিল্পমাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

(৪) শিক্ষকের বেতন উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী ক'রে হবে।

ডক্টর জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে এক সমিতি গঠিত হ'ল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সমিতি অধিবেশনের চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদন (Report) দিলেন।

প্রথম তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট—

(১) একটি মূল শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান চলবে এবং শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে।

(২) শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে—শিক্ষকের বেতন শিক্ষার্থীর তৈরী জিনিস বিক্রী ক'রে পাওয়া যাবে।

(৩) এই শিক্ষায় দৈহিক শ্রম থাকবে এবং তার ফলে শ্রমের প্রতি মর্য্যাদাবোধ জাগবে।

(৪) যে বিষয় শিশুকে শেখানো হবে, তা যেন তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়।

(৫) শিশুদের সুনাগরিক হবার শিক্ষা দিতে হবে।

পাঠ্যক্রম—

(১) শিক্ষাকাল ৭—১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত হবে। শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক হবে।

(২) যে-কোন একটি শিল্প—বস্ত্রবিদ্যা, দারুশিল্প, ফল ও সব্জি চাষ, কৃষিকাজ, চর্ম্মশিল্প, শিক্ষা-সম্ভাবনাযুক্ত যে-কোন গ্রামীণ শিল্প।

(৩) কাতাইয়ের প্রাথমিক জ্ঞান।

(৪) গণিত, সমাজ-বিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কন, সঙ্গীত, হিন্দুস্তানী ভাষা।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষার কার্য্যক্রম-স্বরূপ গ্রহণ করা হয় এবং এপ্রিল মাসে মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধার কাছে সেবাগ্রামে হিন্দুস্তানী তালিমী

সংঘ গঠিত হ'ল, আর শিক্ষক-শিক্ষণের জন্যে ওয়ার্দ্ধায় প্রথম কেন্দ্র খোলা হ'ল।

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন-ব্যাপারে ক্ষমতালাভের পর দেশবাসী অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি জানান। এই কাজ নিঃসন্দেহে ব্যয়সাধ্য। সঙ্কট হ'ল এই যে, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন করতে গেলে আয় অনেক কমে যায়, তার ফলে শিক্ষার ব্যয় কমে, অথচ তা অব্যাহত রেখে শিক্ষা চলে না। তাই গান্ধীজী এই সঙ্কট উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন গান্ধীজী রুশ সাহিত্যিক ও সমাজসেবক মহামতি টলস্টয়ের প্রতি অনুরক্ত হন। টলস্টয়ের লেখা—'The Kingdom Of God Is Within You' গ্রন্থখানি গান্ধীজীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। গান্ধীজী তাঁর নামে 'টলস্টয় ফার্ম্ম' প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং কৃষিকাজ, রন্ধন, কাপড়-কাচা ইত্যাদি সব কাজ করতেন। ঐ সময় রাস্কিনের লেখা "Unto The Last" বইখানি পড়ে গান্ধীজীর মনে সর্ব্বোদয়ের ধারণা জন্মাতে থাকে। "ফিনিক্স আশ্রম" নামে আর একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। শিশুদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, শিশুরা কাজ করতে আনন্দ পায়। কাজ না হ'লে তারা থাকতে পারে না। এই পরীক্ষা-সিদ্ধ ধারণা তাঁকে কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনে প্রণোদিত করে। কাজ করলে পড়ার ক্ষতি হয় না, নতুন এক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। শিশুরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা বেশী স্থায়ী হয়। তাছাড়া, শিক্ষার জন্যে যে ব্যয়, তা বহন করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে তিনি ভারতে আসেন। সবরমতীতে (আমেদাবাদ) তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। "হরিজন" পত্রিকার স্তম্ভে যা তিনি অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবার প্রয়াস করেছেন, তা আকস্মিক দীপ্তি-স্বরূপ তাঁর অন্তরে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তার সত্যতা তিনি দিন দিন অধিকতর উপলব্ধি করেছেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচনায় দেখা যায় যে, সরকার, স্থানীয় সমিতি ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় পরিচালিত বিদ্যালয়ে কাজ চলেছে। ছেলেদের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া ও আচরণ বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের

child of seven to fourteen years of age, the field of Nai Talim stretches from the hour of conception in the mother's womb to the hour of death." শিক্ষার চারটি স্তর হ'ল—বয়স্ক-শিক্ষা, প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা ও উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা। বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা হ'ল এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচিত হ'ল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সেবাগ্রামে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় কাজ আরম্ভ করে। খের সমিতির ফলে মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কাজ হয়।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জি. রামচন্দ্রণের নেতৃত্বে গঠিত মূল্যায়ন কমিটি (Assessment Committee on Basic Education) মনে করেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা মোটেই ভালো নয়। শিক্ষা-বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর জন্যে বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাঁদের বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশ্বাসের অভাব তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরা এই মত প্রকাশ করেন যে, শিল্পকাজ উৎপাদনাত্মক হওয়া দরকার।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বুনিয়াদী শিক্ষার জাতীয় কেন্দ্র (National Institute of Basic Education) স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল—বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কাজে উৎসাহদান, বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত সাহিত্য-সৃষ্টি, বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতিমূলক তথ্য সরবরাহ এবং শিল্প ও কলা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। একটি কাজ হ'ল—সর্ব্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচেষ্টায় সাহায্য ও পরামর্শ দান। গত কয়েক বছর থেকে জানুয়ারী মাসের ২০শে থেকে ২৬শে তারিখ পর্য্যন্ত এই সাতদিন বুনিয়াদী শিক্ষা সপ্তাহ হিসাবে পালন করার নির্দ্দেশ সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে। ভারতে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :—

১৯৫০-৫১ খ্রীঃ	১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ	১৯৬০-৬১ খ্রীঃ	১৯৬৫-৬৬ খ্রীঃ
৩৩,৩৭৯	৪২,৯৭১	১,০১,৭১০	১,৫৪,২৪১

পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বপ্রথম নঈ তালিমের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে বেসরকারী প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বাংলায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে। এখানে জরুরী তিন মাসের একটি বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলা হয়। আটটি শিশু-সদন ও তিনটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ আরম্ভ হয়। পরে এই কেন্দ্রটি মেদিনীপুর জেলারই বলরামপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। বলরামপুরে মোটামুটি হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘের পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ জন শিক্ষককে সেবাগ্রামে শিক্ষণ দেওয়া হয়। বাংলায় বুনিয়াদী শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ সভানেত্রী এবং শ্রীমতী যমুনা ঘোষ সম্পাদিকা হন। ২৫ জন শিক্ষক ৬ মাসের শিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩৪ জন শিক্ষার্থীকে (পুরুষ ও মহিলা) এই কেন্দ্রে শিক্ষণ-গ্রহণের জন্যে পাঠান এবং তাঁরা শিক্ষণ সমাপ্ত করেন। দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকজন বিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তা ও নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে সেবাগ্রামে বুনিয়াদী শিক্ষণের জন্যে পাঠান। তাঁরা এক বছর শিক্ষণশেষে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ২টি বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয় (বর্ত্তমানে মহাবিদ্যালয়) খোলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দেই সরকার ২টি বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ও খোলেন। পুরুষদের জন্যে কলেজটি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাইগাছিতে (২৪-পরগণা) এবং মহিলাদের জন্যে কলেজটি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আলিপুরে (কলিকাতা) স্থাপন করেন। কলেজ ও বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। অর্থ নৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতায় কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে এবং শিল্পকাজের জন্যে যে কাঁচামালের খরচ হয়, তা শিল্পকাজ থেকে মিটে যেতে পারে,—ইহা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে জলখাবারের ব্যবস্থা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক ইত্যাদির খরচ যাতে উঠে—এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইংরাজী এখন তৃতীয় শ্রেণী থেকে শেখানো হচ্ছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্ত ধারা গৃহীত না হওয়ায় এবং জাতীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা ও প্রচলিত শিক্ষাকে একত্র বেঁধে একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায়, খণ্ডিত আকারে সব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে জাতির সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, আট বছর শিক্ষাকাল শেষ হবার পর শিশুরা নীচের বিষয়গুলি শিখবে :—

(১) কঠিন কাজ করবার উপযুক্ত সুস্থ ও সবল শরীর।

(২) সহযোগিতামূলক নতুন সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান হবে ও কুটীরশিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝবে।

(৩) নিজের সুষম খাদ্য ও কাপড়-জামার জন্যে প্রধান শিল্পকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা জন্মাবে।

(৪) তূলা থেকে কাপড় তৈরি করবার ক্ষমতা জন্মাবে।

(৫) নিজের প্রয়োজনের জন্যে শাক-সব্‌জি উৎপাদন করতে পারবে।

(৬) রান্না করা, ভাঁড়ার-ঘর গোছানো, পরিবেশন ইত্যাদি করতে পারবে এবং বাজেট ও ভোজনাগারের হিসাব রাখতে পারবে।

(৭) স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি, প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা জানবে।

(৮) সমবায় ভাণ্ডার চালাতে পারবে।

(৯) সাধারণ সভায় বক্তৃতা ও আলোচনা করতে পারবে।

(১০) প্রতিবেদন তৈরি ও স্পষ্টভাবে বিষয়বস্তু লিখতে পারবে।

(১১) ভক্তিমূলক, জাতীয় ও আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত অন্ততঃ সমবেত কণ্ঠে গাইতে পারবে।

(১২) সংবাদ পাঠ ক'রে পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক খবর জানবে।

(১৩) তার শিল্পজ্ঞান হবে।

(১৪) ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস সে জানবে।

(১৫) অন্য ধর্ম্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা জাগবে এবং

(১৬) গ্রামের প্রতি আকর্ষণ থাকবে ও গ্রামের জন্যে কাজ করবে। এছাড়া, আরও কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রথমদিকে কাজের অসুবিধাও হয়েছে। যেমন—(১) কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রাথমিক পর্য্যায়ে ছিল; (২) বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ্য-পুস্তক তৈরি হয়নি; (৩) যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব; (৪) জনগণের নিক্রিয়তা বা আগ্রহের অভাব এবং (৫) নতুন সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা না থাকা।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় গান্ধীজী স্বাবলম্বনের ওপর খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন—"The only true education is that which is self-supporting. Self-supporting is the acid test of its reality." কিন্তু সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় স্বাবলম্বনের ওপর জোর কমিয়ে দেওয়া হয়। আচার্য্য জে. বি. কৃপালনী বলেছেন—"If the work done has no economic value it is cut-off from reality and the facts of life. Work done becomes only a means and as means it is emphasized to the neglect of the other, the whole scheme which is an organic one, will sooner or later collapse. For Gandhiji craft is not merely a means of literary education, it is also an end in itself, it will lose progressively its economic value, efficiency and significance." ছেলেমেয়েদের পরিপূর্ণ শিক্ষার আধার হবে আয়কর-শিল্প। ভারতের কোটি কোটি জনের শিক্ষার জন্যে দরকার স্বাবলম্বনের। গান্ধীজী বলেছিলেন—"I am very keen on finding the expenses of a teacher through the product of the manual work of his pupils, because I am combined that there is no other way to carry education crores of our children. We cannot wait until we have the necessary revenue."

সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়:—

প্রথমতঃ, এতে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের শিক্ষা আবশ্যিক করার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী শিক্ষার নিম্নস্তরে ইংরাজী শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী এই সমিতি নন।

তৃতীয়তঃ, শিশুদের তৈরী দ্রব্যাদির বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা স্বাবলম্বী হবে—সমিতি এর পক্ষে নন। সমিতি মনে করেন যে, হাতে-কলমে কাজের জন্যে অতিরিক্ত উপকরণ ও সামগ্রীর খরচ এই অর্থ দ্বারা সঙ্কুলান হ'তে পারে।

চতুর্থতঃ, ৬ থেকে ১১ বছর বয়স পর্য্যন্ত নিম্ন বুনিয়াদী এবং ১১ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত উচ্চ বুনিয়াদী—এই দুটি ভাগ করা হয়েছে। কারণ এঁদের মতে, দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন হয় ব'লে পাঠ্যসূচীরও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষকের বেতনের উন্নতির কথা এতে বলা হয়েছে।

এই পরিকল্পনাকে রূপদান করতে ৪০ বছর সময় দরকার হবে। নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষায় মোট ২০০ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা লাগবে। সময়, অর্থ ও কর্ম্মী—এই তিনটি বিষয়ে সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় কোনও ভরসা পাওয়া যায়নি। তবে আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে আমরা জেনেছি।

প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় (৬—১১ বছর) সম্বন্ধে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি যে, সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা বহুলাংশে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে ইংরাজী বর্জ্জন, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং কোন উৎপাদনাত্মক শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। কিন্তু সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় উৎপাদনাত্মক শিল্পকে পরিত্যাগ ক'রে শিশুদের শিক্ষামূলক শিল্প শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। উপরন্তু, শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক বা অধিক সংখ্যায় শিক্ষিকা নিয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক স্তর শেষ করার পর বাছাই ক'রে যারা উচ্চ শিক্ষালাভের যোগ্য শুধু তারাই উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবে, আর বাকী সকলে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাবে।

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্তরের (১১—১৪ বছর) পরিকল্পনায় ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার সঙ্গে বহিরঙ্গে মিল থাকলেও, কয়েকটি মৌলিক পার্থক্যও

লক্ষিত হয়। সার্জ্জেণ্ট স্কীমেও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে হিন্দী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় গান্ধীজী 'Plus vocation minus English' বলেছিলেন। সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপার প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় বৃত্তি হিসাবে কোন শিল্প শেখার কথা বলা হয়েছিল, সার্জ্জেণ্ট স্কীমে তা বহাল রইলো। এমন কি, খানিকটা উৎপাদনাত্মক শিল্পের কথাও বলা হ'ল। সার্জ্জেণ্ট স্কীমে ১১—১৪ বছর সহ-শিক্ষা মানা হয়নি। তাদের পৃথক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এমন কি, শিক্ষণীয় বিষয়ও আলাদা ক'রে দেবার কথা উঠলো। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় প্রার্থনা ছিল, সার্জ্জেণ্ট স্কীমে তা বর্জ্জন করা হয় এবং ইহা সম্প্রদায়বিশেষের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই স্তরের পরীক্ষা বিদ্যালয়ে শেষ ক'রে বিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট দেবার কথা হয়েছিল। এই স্তরের পাঠ শেষ ক'রে তারা একটি শিল্প অবলম্বন করে জীবিকার্জ্জনের যোগ্যতালাভ করবে। যারা উচ্চ শিক্ষালাভের উপযুক্ত হবে, তারা উচ্চশিক্ষায় নিম্ন শিল্প বিদ্যালয়ে বা বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে গিয়ে ২ বছর শিক্ষালাভ করবে। বেশীর ভাগ সাধারণ ছাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করবে।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা ও সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার তুলনা করলে দেখা যাবে যে, সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় শিক্ষাকাল ৭ বছরের স্থলে এক বছর বাড়িয়ে ৮ বছর করা হয়েছে।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় শিক্ষার ব্যয়-নির্ব্বাহ শিশুদের কাছ থেকে হবে বলা হয়েছে। কিন্তু সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় ব্যয়-নির্ব্বাহ সম্বন্ধে কোনও ভরসা পাওয়া যায়নি।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় ৭ বছরের শিক্ষাকালকে এক ও অবিভাজ্য ব'লে ধরা হয়েছে; কিন্তু সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী —এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় ইংরাজীর স্থান নেই, রাষ্ট্রভাষার আছে। সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় ইংরাজী ঐচ্ছিক।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় শ্রেণীহান ও শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলা

হয়েছে। কিন্তু সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় এই ধরণের কোনও কথা বলা হয়নি।

গান্ধীজীর পরিকল্পনায় যথেষ্ট বাস্তবতা ও বলিষ্ঠতা ছিল। যদি সামগ্রিকরূপে বুনিয়াদী শিক্ষা গৃহীত হ'ত, তাহলে ইহা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়ে উঠতো।

ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থ নিম্নরূপে প্রচার করেছেন :—

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা বলতে গান্ধীজী বুঝেছেন, সারাজীবনব্যাপী একটি শিক্ষা-পদ্ধতি—তাঁর মতে বুনিয়াদী শিক্ষা সারাজীবনের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা। এর লক্ষ্য হ'ল—শ্রেণীহীন, শোষণহীন, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একটি অহিংস সমাজ প্রবর্ত্তন এবং গ্রহণযোগ্য উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজ গ্রহণ করা।

(২) শিক্ষার্থী যাতে একটি মূল শিল্প ভালভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে, তা দেখা।

(৩) শিক্ষার্থী শিল্পকাজ ভালভাবে শিখবে—উৎপাদনের জন্যে যেন শিল্পকাজ ব্যাহত না হয়—সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৪) এমন শিল্প বেছে নেবে যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা বিষয় শিখতে পারবে। শিল্প যেন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়।

(৫) বুনিয়াদী শিক্ষায় পুস্তক-পাঠ অপ্রয়োজনীয় নয়। ভালো গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ে থাকা দরকার।

(৬) বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে।

(৭) বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা নয়। শহরেও এর উপযোগিতা কম নয়।

আলোচনা : (Criticism)

জাকির হোসেন কমিটি শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন যে, এতে নতুনত্ব কিছু নেই। প্রকৃতি মানুষকে শিক্ষা দেয়। আমেরিকায় এই ধরণের শিক্ষার নাম প্রজেক্ট পদ্ধতি; রাশিয়ায় এর নাম বহুমুখী পদ্ধতি

(complex method)। কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ইহা ঠিক নয়। একটি সঙ্কীর্ণ মাধ্যমের সাহায্যে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলে, শিশুর জ্ঞান অগভীর ও ক্রটিপূর্ণ হবে।

শিশুর কাছে সৃজনমূলক কাজের আবেদন বেশী। অর্থকরী কাজের মূল্য বয়স্কদের কাছে। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় অর্থকরী কাজকে সৃজনমূলক কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু দুটির প্রকৃতি বিভিন্ন। অর্থকরী কাজ মানুষকে যন্ত্রের মতো ক'রে তোলে; কিন্তু সৃজনমূলক কাজ আনন্দের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত শক্তিকে বিকশিত করতে চেষ্টা করে। কাজে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ থাকলে তা সবিশেষ উপযোগী; যেমন—খেলাধূলা। কিন্তু একটিমাত্র শিল্পের মাধ্যমে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। পি. এস্. নাইডু বলেছেন—"বর্ত্তমানে একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে যেমন পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন অংশ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, একটি শিল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিষয় সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। মূল শিল্পের সঙ্গে সমস্ত পাঠ্য-বিষয়ের যে গভীর যোগাযোগ থাকবে—এ আশা করাও ঠিক নয়। শিক্ষা শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যে একটিমাত্র শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হ'তে হবে—এ ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভুল।" শিল্পকে শিক্ষার সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করতে, শিক্ষাকে শিল্পের উপর নির্ভরশীল না করার জন্যেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। ডাঃ জাকির হোসেন বলেছেন—"We consider the scheme of Basic Education to be sound in itself. Even if it were not self-supporting in any sense it should be accepted as a matter of sound educational policy and as an urgent measure of national reconstruction."

উৎপাদনাত্মক কাজ থাকায়, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা সম্প্রসারণের উপযোগিতা পেয়েছে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে শিল্প, সমাজ ও প্রকৃতি শিল্পের মধ্যে রয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় মানসিক বিকাশকে গৌণ মনে করা হয়েছে।

মূল পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, শিল্প-নির্ব্বাচনে শিক্ষার্থীর সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। ডিউই-ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। আমাদের দেশে ৫% লোক বস্ত্র বয়নের কাজ করে, ৭০% লোক কৃষিকাজ করে। তাই, কৃষিকে নির্ব্বাচন না করায় এই নীতিতে অসামঞ্জস্য রয়েছে ব'লে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া, কাতাইয়ের এই ব্যবস্থায় অস্বস্তিকর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে ছাত্ররা হোটেলে পরিচারকের কাজ করে, কৃষি-খামারে ভৃত্যের কাজ করে এবং খবরের কাগজ বিক্রী ক'রে নিজের লেখাপড়ার খরচ সংগ্রহ করে। আমাদের দেশেও এই ধরণের ব্যবস্থা খুব সামান্যই আছে। অধ্যাপক কে. টি. শাহ এই নীতিকে 'বিনিময় ব্যবস্থা' (Exchange motive) বলেছেন। শিক্ষক শিশুকে খাটিয়ে অর্থ উপায় করবেন। গান্ধীজী বলেছেন—"ভগবান আমাদের শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে কিংবা আনন্দে কাল কাটাবার জন্যে সৃষ্টি করেননি; কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জ্জনের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন।" শিশুর শ্রম শোষণ সম্বন্ধে প্রকৃত কোন গবেষণা আমাদের দেশে হয়নি। সেবাগ্রাম ৭০% স্বাবলম্বী হয়েছে ব'লে দাবি করেছে। যাই হোক, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত স্বাবলম্বনের অভ্যাস গঠন করা।

এই শিক্ষা মানুষের মনকে ক্রমশঃ শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন গ্রাম্য জীবন ও কুটীরশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে আকর্ষণ করবে। অথচ, অন্যত্র উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিযোগিতা চলেছে। শিশুকে বয়স্ক বয়সের জন্যে শিল্পে পারদর্শী ক'রে তুলতে হ'লে তা আবশ্যিক করতে হবে। ব্যষ্টি ভালো হ'লে সমষ্টি ভালো হবে ব'লে অনেকে মনে করেন। বৃত্তি-শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর বৌদ্ধিক জ্ঞানও হবে। হস্তশিল্পের জন্যে যে ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় আছে, তা বেশী নয়; কারণ, শিল্পকাজের জন্যে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি প্রক্রিয়া ঐ সময়ে করা দরকার হবে। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির অপচয় যদি খুব সামান্য হয়, তাহলে তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। কাতাই ও বয়ন শিল্পের ওপর অত্যধিক জোর দেওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। তবে প্রয়োজনবোধে কাতাইকে বাদ দিয়ে অন্য শিল্প নিলেও কাজ চলবে।

শিক্ষার মাধ্যম উপযুক্ত হয়েছে। ঠিকমতো শেখাতে পারলে বৌদ্ধিক বিকাশ কম হবার কোনও কারণ নেই। অবশ্যই এই শিক্ষার পরিচালনা খুবই কঠিন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বুনিয়াদী শিক্ষা জাতির পশ্চাদ্‌গতির লক্ষণ—এ-কথা ঠিক নয়। সব স্তরে ঠিকমতো কাজ হ'লে এর কার্য্যকারিতা বোঝা যেত। উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে অনুবন্ধ-প্রণালীর কথা বেশী না ভাবলেও চলবে। ঐ পদ্ধতিতে মানসিক প্রচয় বেশী না হ'লে মামুলী পদ্ধতিতে পাঠদান করাই শ্রেয়ঃ। এতে চারুকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। কংগ্রেস জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি বলেছেন, "বীজগণিত শিক্ষাদান কোন একটি শিল্পের মাধ্যমে আদৌ সম্ভব নয়।"

বুনিয়াদী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষার মূল্য দেওয়া হয়নি ব'লে কেউ কেউ মনে করেন। গান্ধীজী বলেছেন যে, উচ্চশিক্ষার জন্যে বেসরকারী প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করতে হবে। যেমন—টাটা কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলবে। আচার্য্য জে. বি. কৃপালনী বলেছেন, "যারা এই বিলাস (উচ্চশিক্ষা) চায়, তাদেরই এই অর্থ ব্যয় করতে হবে। ভারতের অশিক্ষিত জনসাধারণ এজন্য অর্থ যোগান দেবে, তা নিশ্চয়ই তাদের আশা করা উচিত নয়।"

কোনও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান মারফৎ বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা হওয়া দরকার। তাহলে এর প্রকৃত রূপ বুঝতে পারা যাবে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় সমাজ-ব্যবস্থা

গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষায় মানবজীবন ও সমাজকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা রয়েছে। সমাজের বনিয়াদ গড়বে ব'লে এর নাম বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজী একে নঈ তালিম বা নতুন শিক্ষা বলেছেন।

পরাধীন ভারতে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাতে শুধু কেরাণী সৃষ্টি হয়েছিল; সেই শিক্ষায় মানুষ স্ব-প্রতিষ্ঠ হ'তে পারেনি। প্রধানতঃ পরের প্রয়োজনে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, নিজের দরকারে তা চলতে পারে না। তাতে

আমাদের সামান্য লাভ হ'লেও অনেক ক্ষতি হয়েছে। বিষবৃক্ষে অমৃতের ফল ধরে না। তাই তাকে বাড়তে দিলে বিষ ছড়ানোর ব্যবস্থাই পাকা হবে। রবীন্দ্রনাথ মর্ম্মে মর্ম্মে তা উপলব্ধি করেছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দী আগে কয়েকটি প্রবন্ধে শিক্ষার গলদ দেখিয়ে তার প্রতিকারের উপায়ের কথা তিনি বলেছিলেন এবং কাজও আরম্ভ করেছিলেন। গান্ধীজীও এ সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে জাতির সামনে এক অভিনব পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন এবং বাস্তবে রূপ দেবার কাজ সুরু করেছেন।

নঈ তালিমের উদ্দেশ্য—শ্রেণীহীন ও শোষণহীন বিকেন্দ্রিত সমাজ-গঠন এবং সত্য ও অহিংসাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত করা। এর একদিকে মানুষের অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র ও আবাসের সমস্যার সমাধান এবং অন্যদিকে নির্য্যাতিত ও বঞ্চিতের অন্তরে প্রতিরোধের স্পৃহা জাগাবার কথা রয়েছে। এতে সুবিধাভোগী শ্রেণীর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হবে এবং তাদের হাত থেকে ক্ষমতা আহরণ ক'রে বঞ্চিত ও নির্য্যাতিতদের মধ্যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার শক্তি উৎপন্ন করবে। মানুষ যদি নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং সেই সঙ্গে শুভবুদ্ধিযুক্ত হয়, তাহলে সে স্নিগ্ধ হবে এবং অন্যায়কে শুভবুদ্ধির বশে ধ্বংস করবে। মানুষ যদি অন্ন ও বস্ত্রে নিজের অন্তরে স্ব-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং স্ব-পর্য্যাপ্ত হয়, তাহলে যারা পরগাছার মতো, তাদের সুবিধার উৎস শুকিয়ে যাবে। কুটীরশিল্পের কথা আসে এইখানে।

প্রকৃতপক্ষে, এ এক বিপ্লব। গান্ধীজীও বলেছেন, "বুনিয়াদী শিক্ষা নীরব সমাজ-বিপ্লবের অগ্রদূত।" এই সমাজে কোনও শোষণ ও পীড়ন থাকবে না এবং মানুষ অর্থ ও যন্ত্রের দাস হয়ে পড়বে না। বুনিয়াদী শিক্ষার শিল্প-নির্ব্বাচনে তাই শিক্ষাগত প্রয়োজন ব্যতীত সামাজিক ও অর্থ-নীতিক দিকও আছে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা শোষণহীন বিকেন্দ্রিত সমাজের স্বাবলম্বী নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে। শোষণহীন সমাজে স্বাবলম্বন বলতে জীবনের অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলিকে নিজের হাতে উৎপন্ন করার যোগ্যতা ও আনন্দের সঙ্গে পূর্ণ আত্ম-মর্য্যাদায় এইসব কাজ করার যোগ্যতা বোঝায়। গান্ধীজী স্বাবলম্বনের ওপর খুব জোর

দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "Self-sufficiency is the acid test of its reality." এই সমাজ-ব্যবস্থায় সকলের সমান অধিকার, জাতি ও বর্ণভেদ প্রথার লোপ, শোষণহীনতা, বিকেন্দ্রিত অবস্থা, ধনের কেন্দ্রীকরণ রুদ্ধ ইত্যাদি হবে। শিশু উৎপাদনশীল স্বাবলম্বী নাগরিক হবে।

একদিকে দারিদ্র্যের কঠোর রূপ এবং অন্যদিকে অর্থপ্রাচুর্য্যের জন্যে জঘন্য বিকৃত রূপ—এই উভয় থেকে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তারই ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি আশা করেছেন, একদিন শোষকদের অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন হবে। তিনি মনে করেন, মানুষের প্রত্যেকটি কাজ ও জীবনের প্রতি পদক্ষেপ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। সত্য ও সেবার আদর্শ এর মূলে নিহিত থাকবে এবং অহিংসা তার চলার পথে প্রধান অবলম্বন হবে। অবশ্য নঈ তালিমে কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্মের স্থান নেই। শুধু সাধারণ প্রার্থনা আছে। সব ধর্ম্মের মুল সুর এতে আছে। কিন্তু আচারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আত্মশুদ্ধি বা চিত্তের উর্দ্ধগতির জন্যে সর্ব্বধর্ম্মীয় সমন্বয়-সাধনকারী প্রার্থনা। কেউ কেউ মনে করেন যে, শ্রেণীহীন সমাজ-রচনায় পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতা বর্দ্ধনে ও পরস্পরকে ঠিকমতো জানার জন্যে এই প্রার্থনা খুব উপযোগী।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে ভেদ বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। ভারতের হিন্দু সমাজের জাতিভেদ দূর করার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়েছে। কিন্তু তার ফলে ধর্ম্মগত ভেদের উৎপত্তি হয়েছে। বৌদ্ধ, শিখ, বৈরাগী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায় স্বতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি করেছেন। শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিবাদ প্রচার করলেও, সমাজ-ব্যবস্থা বা লোকাচারে হস্তক্ষেপ করেননি। রামানুজ, কবীর, চৈতন্য, একনাথ, তুকারাম, রামমোহন রায় প্রভৃতি অস্পৃশ্যতার নিন্দা করেছেন। যেখানে অস্পৃশ্যতা নেই (মুসলমান ও ইউরোপীয়), সেখানেও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রভৃতি ভেদ আছে। কালক্রমে শিক্ষা ও প্রচারের ফলে অনেক বিষয়ে ভেদজ্ঞান কমে যাবে। মানুষের ন্যায়বুদ্ধি ক্রমশঃ বাড়বে ; ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য কমবে। রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার হবে ; তার ফলে শ্রেণীভেদ কমবে।

আমরা বিবেকানন্দের প্রেরণা পাই—শিক্ষাচিন্তা, ধর্ম্মচিন্তা, অধ্যাত্ম-সাধনায়, শিল্প-চেতনায় ও সমাজকল্যাণ কামনায়। তিনি সমাজ-দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। সমাজে বর্ণবৈষম্য ও সমাজ-দেহে অবসাদ ও অপচয় ছিল। বজ্রনির্ঘোষ বাণীর কশাঘাত দিয়ে তিনি সকলকে জাগিয়েছেন এবং সমদর্শন ও ভালবাসার কথা বলেছেন। দেবতাবুদ্ধি দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে বলা হয়েছে আমাদের সম্প্রদায়-দুষ্ট মনকে।

জাতীয় আদর্শ-ব্যবস্থার প্রতিফলন হয় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায়। দেশের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন-লক্ষ্যকে রূপ দেয় শিক্ষা। আবার জীবন-লক্ষ্যও গড়ে তোলে শিক্ষা-ব্যবস্থা। কোন জীবগোষ্ঠীর ব্যষ্টিবিশেষের টিকে থাকার জন্যে দরকার পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন। পরিবেশ তৎপরতার অবিরাম প্রয়াসই হচ্ছে বিবর্ত্তনের কথা। মানুষ এখন চায় পরিবেশকেই নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির কাজে লাগাতে। সজ্ঞান উদ্দেশ্যবোধের দ্বারা প্রণোদিত তার চির-প্রসারণশীল কর্ম্মক্ষেত্র। তাই সামাজিক পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দরকার হয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের। গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, শিক্ষা-সংস্কার হ'লে সমাজ-সংস্কার হবে। মানুষ গড়ে ওঠার শ্রেষ্ঠ সময় তার শৈশব ও কৈশোর। বর্ত্তমানের একটি লক্ষণ ব্যক্তিস্বাধীনতা। এর জন্যে মানুষ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভুলে যায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় তিনি এই দোষ দূর করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষের জীবনবোধের এই বৈষম্য সংশোধন ক'রে সুস্থমনা সামাজিক জীব গড়ে তুলতে। তাই তিনি শিক্ষায় কাজের ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজ উদ্দেশ্যমূলক, সমাজ-কল্যাণকর ও সৃজনী-শক্তি বিকাশের সহায়ক। বুনিয়াদী শিক্ষার এটি একটি বৈশিষ্ট্য। সুগঠিত মানব-সমাজের মেরুদণ্ড হচ্ছে উৎপাদন। এর ওপর নির্ভর করে সমাজের অস্তিত্ব। তাই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষায় এই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন শিক্ষা পরিকল্পনা করেছেন। আগে নীতি ছিল, ব্যষ্টি ভালো হ'লে সমষ্টি ভালো হবে। এখন সামাজিক হ'ল। বিভিন্ন স্তরও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব'লে স্বীকৃত হ'ল। কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব'লে শিক্ষার্থী তার কাজের ফলাফল জানতে পারে, তার সাফল্য ও প্রাপ্তির তৃপ্তি আসে এবং শিক্ষার

উদ্দেশ্য সে বুঝতে পারে। একদিন বুদ্ধি ও হাতের কাজ তফাৎ হয়েছিল জাতিভেদে। এই বৈষম্য এতে দূর করবার চেষ্টা হয়েছে। ইংরাজী-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সামাজিকতা-বোধ আমরা হারিয়েছি। মাতৃভাষায় শিক্ষা হওয়াতে এই ত্রুটি দূর হয়েছে। জাতীয় অহেতুক জাতিভেদের অর্থাৎ হাতে-কলমে কাজের প্রতি অবজ্ঞার মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। হাতের কাজ শিখলে, লেখাপড়া ছাড়লেও, জীবন-সংগ্রামের কিছু হাতিয়ার হবে। এই শিক্ষা সহযোগিতামূলক ; তাই শিশু আত্মনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় জীবন-যাত্রার প্রণালী শিক্ষালাভ করবে। ডাঃ জাকির হোসেন বলেছেন—"The scheme envisages the idea of a co-operative community, in which the motives of social service will dominate all the activities of children." গান্ধীজীর অর্থনীতির মূলকথা হ'ল—"To reform the individual to reform the society, to reform the society to reform the nation and the nation to reform the world as a whole." যাই হোক, তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের দুঃখ-কষ্ট মোচনের উপায় হ'ল—অভাব হ্রাস করা।

পাশ্চাত্য দেশ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার শীর্ষে অবস্থিত। পাশ্চাত্য অর্থনীতি হ'ল—আরও কামনা কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও রোজগার কর (Want more, work more, earn more)। ইউরোপ ও আমেরিকায় মোটরগাড়ী, রিফ্রিজারেটার, বিজলী-উনান, ধূলা-ঝাড়া কল, কাপড়-কাচা কল ইত্যাদি দরকার। তারা মনে করে যে, এই সবের জন্যে তাদের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু। বর্ত্তমান কালের মার্কিনের জীবন-যাত্রাকে Max Lerner-এর ভাষায় চিনতে হ'লে বলা যায়—The culture of Machine Living. সমাজ-তত্ত্ববিদ্ সিগফ্রিড্ গিনিয়ন বলেছেন—মাটি, রুটি, গৃহ, মৃত্যু। মেকানাইজেশান, শিল্প ও যন্ত্র-বিজ্ঞানের অমোঘ নির্দ্দেশ—শৃঙ্খলা ও গতিবেগ। ওদেশের লোক স্নায়ু-বিকারগ্রস্ত—বিরক্ত স্নায়ুর প্রাদুর্ভাবে। Neurosis ও অনিদ্রায় বহুলোক ভোগে। উদগ্র ভোগ-সর্ব্বস্বতা এবং নিঃস্পৃহ আধ্যাত্মিকতা—উভয়ই সমাজের পক্ষে

ক্ষতিকর। শয্যায়, রন্ধনশালায় ও স্নানাগারে যন্ত্র। ছিট্‌গ্রস্ততা, মানসিক বিকার এবং যৌন-বিকারের প্রাবল্য সেখানে দেখা যাচ্ছে। বিয়ে-করা ও বিয়ে-ভাঙার মধ্যেও হাঁফ ধরা রয়েছে। টেলিভিশন, টেলিফোন, সুপার হাইওয়ে, প্রতি তিনজনে একখানি গাড়ী, পার্কির মিটার, ট্রাফিকের অরণ্য, স্লট মেসিনে কেনা ডিনার, প্যাকেজে মোড়া আধা-রান্না করা খাদ্য-বস্তু। আমেরিকায় বৃহৎ টেকনোলজির দান বিস্ময়কর। আমেরিকানরা সব সময় বলে—'I have got problems.' সেখানে marriage counseller আছে। যন্ত্র অল্প সময়ে পরীক্ষার খাতা দেখে! এছাড়া আছে বৈদ্যুতিক ক্ষুর, টুথব্রাশ, বৈদ্যুতিক ছুরি। 'Like knife in butter' —কথাটি পাল্টে যেতে বসেছে। মেশিনে চুল শুকানো হচ্ছে। অনেকে বলেন, মার্কিন জীবন নাকি গণিতের অঙ্ক। যন্ত্রের ছক্ মেপে চলে। বিদেশে 'রবট'-এর সাহায্যে ট্রেন চালানো হচ্ছে। জন্মেছে নিউ ইয়র্কে, পড়তে গেছে নিউ ইংল্যাণ্ডে, প্রথম চাকরি করতে গেছে দেড় হাজার মাইল দূরে মিসৌরিতে এবং শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে ক'রে বাড়ী কিনে বসতভিটা পত্তন করেছে হয়ত লস্ এঞ্জেল্‌স্-এর ধারে—নারী পুরুষ উভয়েই। জনৈক বিদেশী ভ্রমণকারী মার্কিন দেশ বেড়িয়ে এসে নাকি একবার বলেছিলেন যে, তাঁর কাছে গোটা আমেরিকাই মনে হয়েছিল—নোয়ার তরী (Noah's Arch)। কেননা, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, স্কুল-কলেজে, সিনেমায়-পার্কে—মার্কিন দেশ সর্ব্বত্র যুগলরূপে।

ডেন্‌মার্কের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান বেশ উঁচু। একজন সাধারণ চাষী—তারও মোটরগাড়ী, টেলিফোন, রেডিও এবং দামী ও সুরুচি-সম্মত আসবাবপত্র আছে। পশ্চিমের যন্ত্রযুগ, বৈষয়িক ঋদ্ধি অথবা চিন্তার সফিস্টিকেশন। স্বয়ং-চালিত সোবিয়েত ট্রাক্টার (টি-১৬)—মানুষের দ্বারা বেঁধে-দেওয়া সীমানার মধ্যে যন্ত্রটি নিজেই ঘুরে ঘুরে কাজ করতে পারে। মস্কোর একজন বিজ্ঞানী একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন—যার গঠন-পদ্ধতি অনেকটা মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের মতো এবং তার কাজও সেইরকম। এই যন্ত্র যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ—এই চার রকমের পাটীগণিতের অঙ্ক কষে দিতে পারে। এই ইলেক্‌ট্রনিক বিদ্যার প্রয়োগে

বা কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি আছে বলা হয় বা প্রয়োজনমতো অভিজ্ঞতা দ্বারা চালিত হয়। ইলেক্ট্রিক কম্পিউটর মিন্স্ক—২২ ফিতা বা কার্ডে ছকে দেওয়া প্রোগ্রাম থেকে যন্ত্রটি ৬০ হাজার অঙ্ক-সংখ্যা মনে রেখে হিসাবপত্র করতে পারে। যাই হোক, পাশ্চাত্য দেশের ধারণা এই যে, দেশের শিল্প-সম্পদ্ বাড়লে মানুষের হাতে অর্থ আসবে এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে পারবে। সভ্যতার চাপে অভাব বাড়লেও, নতুন উৎপাদন-যন্ত্রের সাহায্যে সেই অভাব দূরীভূত হবে এবং এইভাবে ভারসাম্য বজায় থাকবে।

কিন্তু, গান্ধীজীর মত হ'ল—আধ্যাত্মিক শান্তি ও মনের সুখই আসল। এর জন্যে অভাব কমানো, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ও উৎপাদনের ওপর নির্ভর করা দরকার। আত্মত্যাগ ও অভাব সীমাবদ্ধ করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে। ভারতের শাস্ত্র বলে—কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নাই। ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায়, তেমনি কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনা কেবলই বাড়তে থাকে, শান্তি থাকে না।

উৎপাদন বাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে কাজে নিযুক্ত লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না; অর্থাৎ, কাজে নিয়োগের সূচী-সংখ্যা উৎপাদনের সূচী-সংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেনি। অপেক্ষাকৃত কম লোকের সাহায্যেই বাড়তি ধন-সম্পদ্ সৃজন সম্ভব। যন্ত্র মানুষের সুখ-সুবিধা ও প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করলেও, মানুষকে কর্ম্মচ্যুত ও ক্ষুধাতুর ক'রে ছাড়ছে। যন্ত্র এদের কাছে অভিশাপ। এরা যন্ত্র-প্রসূত প্রাচুর্য্যের অংশভাগী হ'তে পারে না। কাজেই বেকারদের কাজের সংস্থান মানব-সমাজের অধিকতর প্রগতিশীল ভাবধারারই পরিচায়ক। বিংশ শতাব্দীতে মানুষ আর যন্ত্রের মধ্যে যে মহাবিরোধ উপস্থিত হয়েছে, মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তিকেই তার সমন্বয়-সাধনের উপযোগী পন্থা ও কর্ম্মকৌশল খুঁজে বের করতে হবে। এছাড়া, যন্ত্রের আবির্ভাব ভারতের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। উৎপাদন-ক্ষেত্রে মালিক স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা পুরাপুরি ভোগ করে। একদিকে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষ বেকার-ভীতির ও আর্থিক নিরাপত্তার ভয়ে দিনরাত অস্থির অবস্থায় কালযাপন

করছে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় ধনিক ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে মনের সুখে গড়াগড়ি যাচ্ছে। যন্ত্রপাতি একদিকে মানুষের কাজ কমিয়ে দেয়, অন্যদিকে পল্লী অঞ্চল থেকে কারখানা অঞ্চলের দিকে মানুষকে টেনে আনে।

প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখছি যে, যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হওয়ার ফলে অতি অল্পলোক বহুলোকের কাজ করতে পারে। যেমন—হাজার হাজার কোদাল চালানোর কাজ ট্রাক্টরের সাহায্যে মাত্র কয়েকজন লোকই করতে পারে। ফলে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এই স্বতঃসিদ্ধ পরিণামের কথা চিন্তা ক'রে তিনি কুটীর-শিল্পের কথা বলেছেন। তাঁর অর্থনীতি বিকেন্দ্রীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাতে যে শ্রমিক, সে-ই মালিক। ফলে, কেউ কাউকে শোষণ করতে পারে না। অথচ শিল্পোৎপাদনের জন্যে তার সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি দিকেরও বিকাশ হয়। তাই বলা হয়েছে, "বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হল—(ক) পরিবারের পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একতাবোধে আবদ্ধ হওয়া, (খ) স্বল্প-আয়তনের শিল্প সমবায়-পদ্ধতিতে কাজ করা এবং (গ) শক্তি-চালিত যন্ত্র ব্যবহারের জন্যে নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ।"

এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা দরকার। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি গান্ধীজীর মনকে উদ্বেলিত করেছিল ব'লে, নিজের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে তিনি নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনা দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে, শিক্ষার মাধ্যমগুলির মধ্যে একটি হ'ল শিল্প। অবশ্য, পরিপূরক হিসাবে আরও কয়েকটি সহযোগী শিল্পও থাকে।

কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন যে, পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার জন্মের আগেই কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। তবে এর বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, ভারতের উপযোগী ক'রে তিনি এই পরিকল্পনা করেছেন এবং যতদূর সম্ভব অনুবন্ধ-প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষার (correlated teaching) কথা বলেছেন। এখানে নিঃসন্দেহে এই শিক্ষার অভিনবত্ব রয়েছে। এতে দেহ, মন এবং

আত্মার সামগ্রিক সত্তার বিকাশ হয়। নিত্যনৈমিত্তিক কাজে পারদর্শিতা আসার সঙ্গে শিক্ষালাভও হয়। শিশু যে কাজ করবে, তা কেবল নিপুণ কারিগর হবার জন্যে নয়—বিকেন্দ্রিত, সাশ্রয়ী ও শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার উপযোগী নাগরিক হবার জন্যে। "মানুষ স্বভাবতঃই কাজ করে এবং তার যাবতীয় জৈবিক প্রয়োজন তার দ্বারা মিটে যায়। এই কাজের মধ্যেই তার আত্মার তৃপ্তি রয়েছে। ইহা তার শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক পূর্ণতার অভিজ্ঞতা ও আনন্দলাভে সহায়তা করে। যে মুহূর্ত্তে মানুষ কোনও কাঁচামাল থেকে তার জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অগ্রসর হয়, সে স্রষ্টা হয় এবং তার শক্তি ও আত্ম-বিশ্বাস বাড়ে; ফলে, বৃহত্তর পূর্ণতার দিকে সে চালিত হয়।"

গৃহশিল্প ও বৃহৎ শিল্প পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হবে। এতে সমাজ-জীবনে পল্লী ও শহরের মধ্যে সহযোগিতার সেতু রচনা করা সম্ভব হবে। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের যেমন প্রাধান্য, তেমনই মিথ্যাচার, কেন্দ্রীকরণ, প্রতিযোগিতা এবং হানাহানিও রয়েছে। যুগধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নির্লিপ্ত থাকলে মনুষ্যত্বকে সেই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিতে হয়। মানুষের মঙ্গলের জন্যে বৃহৎ শিল্পের যতটুকু দরকার, ততটুকুই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

যন্ত্র প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন—"আমি যন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাই না, তার কর্ম্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করতে চাই। কুটীরবাসী কোটি কোটি মানুষের কর্ম্মভার লাঘব করবে যে যন্ত্র, তাকে আমি স্বাগত জানাই। যদি গাঁয়ের ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দিতে পারি, সেই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে গ্রামবাসীরা যন্ত্র চালালে আমি ক্ষুণ্ণ হব না। কিন্তু, স্বল্প-সংখ্যক লোকের হাতে বিত্ত ও ক্ষমতা সঞ্চয় করার জন্যে লক্ষ লক্ষ গাঁয়ে যে সজীব যন্ত্র ছড়িয়ে আছে, তার বিকল্পে প্রাণহীন যন্ত্র বসাতে চাই না। আমাদের দেশে যা-কিছু প্রয়োজন, তা যদি তিন কোটি লোকের বদলে ত্রিশ হাজার লোকের দ্বারা প্রস্তুত হয়, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ প্রায় তিন কোটিকে অলস ক'রে বসিয়ে রাখা চলবে না।" তিনি বলেছেন—"If machine means lessening labour and increasing leisure, then it is a boon." তিনি বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের বিরোধী ছিলেন

না। বর্ত্তমান বেকার অবস্থার জন্যে তিনি কুটিরশিল্পের কথা বলেছেন। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থ পুঞ্জীভূত হবে ও তারা শোষণ করবে—তা তিনি চাইতেন না। কারখানার বর্ত্তমান পরিবেশে শ্রমিকদের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা প্রসারলাভ করে ব'লে তিনি এ পচ্ছন্দ করতেন না। মানুষের উপকারের জন্যে যন্ত্রকে যদি ঠিকমতো কাজে লাগানো যায়, তাহলে তার সুবিধা নিয়ে মানুষ তার দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার অনেক সুযোগ পাবে। তাকে অনেক বেশী কায়িক পরিশ্রম ক'রে সময় ও শক্তি নষ্ট করতে হবে না, নিজের মনকে উন্নত করবার, জীবনকে উপভোগ করবার সময় মানুষ পাবে।

কিন্তু যন্ত্রের অধিক প্রচলনের জন্যেই আমাদের পরমুখাপেক্ষী হ'তে হয়েছে, অন্যের অধীনও হ'তে হয়। বিদেশে পোষাকের জন্যে, নিত্য-নৈমিত্তিক আহার, বাসন-কোশনের জন্যে কত ভারী যন্ত্রশিল্পের প্রচলন ভারতীয়রা পাতায় আহার্য্য সাজায়, আঙুল দিয়ে আহার করে। সর্ব্ব-সম্পূর্ণ চূড়ান্ত স্বাধীনতা হ'ল—সর্ব্ববিষয়ে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবহার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। যন্ত্রের ধ্বংসসাধন গান্ধীজীর উদ্দেশ্য নয়, সীমার মধ্যে এনে যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করাই তাঁর আন্তরিক অভিপ্রায়। "যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমার আপত্তি নয়, আপত্তি যন্ত্রের জন্যে উন্মাদনার বিরুদ্ধে।...... সময় ও শ্রমের লাঘব আমারও বাঞ্ছনীয়; কিন্তু কেবলমাত্র বিশেষ একটা শ্রেণীর পরিবর্ত্তে সমগ্র মানব-জাতিই উহার সুফল ভোগ করুক" (গান্ধীজী)। মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে শক্তি ও ধন-সম্পদ্ কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার তিনি পাপ ও অবিচার ব'লে মনে করতেন। বর্ত্তমানে যন্ত্র ঠিক এইভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। "পল্লী শিল্প-প্রচেষ্টা এমন সব যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করবে, যা জনগণকে কাজের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না ক'রে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সাহায্য করবে, তার যোগ্যতা বাড়াবে। আর এইসব যন্ত্রপাতি এমন হবে যা মানুষকে তার দাসে পরিণত করতে পারবে না; মানুষই ইচ্ছামতো এইগুলির ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।"

"পাড়াগাঁয়ের প্রত্যেকটি বাড়ীতে যদি বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা সম্ভব

হয়, তাহলে পল্লাবাসীরা যদি তাদের যন্ত্রপাতি বিদ্যুতের সাহায্যে চালায়, তবে আমি ভ্রূক্ষেপও করবো না” (গান্ধীজী)। আমেরিকায় আগে লক্ষ লক্ষ টন গম নষ্ট করা হ'ত। এখন তারা নষ্ট করে না, তবে শস্য উৎপাদন না করবার জন্যে তাদের টাকা দেওয়া হয়।

“বৃত্তি শেখার মূল উদ্দেশ্য তাঁতী বা ঐ ধরণের মিস্ত্রী হয়ে জীবিকার্জ্জন করতে শেখা নয়; শেখার ভেতর দিয়ে নানা বিষয়ে সহজ উপায়ে জ্ঞানার্জ্জন ক'রে, বৃত্তির নানা অংশের তাৎপর্য্য ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ উপলব্ধি ক'রে ও সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকুশলতা ও উচ্চাঙ্গের সৃজনী-শক্তি আয়ত্ব ক'রে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ-সাধনই বৃত্তি শেখার মূল উদ্দেশ্য।” এতে যতদূর সম্ভব আনন্দের মধ্য দিয়ে অনুবন্ধ-প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। “বুনিয়াদী শিক্ষায় অনুবন্ধ-প্রণালী বলতে সঙ্গ অপেক্ষাও গভীর সম্বন্ধ বুঝায়; ইহা কাজ এবং কাজের মাধ্যমে শিক্ষার সম্বন্ধ।”

কাজ ব্যতীত শিক্ষা অসম্পূর্ণ। অর্থনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী হ'লেও, সুদক্ষ ব্যবসায়ী না হওয়াই স্বাভাবিক। রন্ধন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করলেই, রন্ধন-বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না এবং সাঁতার শিখতে হ'লে বই মুখস্থ করা কোনও কাজে লাগে না। সাঁতার শিখতে হ'লে জলে নামতেই হবে। ছ্যাত্‌লা-পড়া দাঁতে, তেল-চিটে ময়লা জামা প'রে শীর্ণ দেহে স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র পুরস্কার গ্রহণ করছে—এমন ঘটনা বিরল নয়। এই ধরণের অসঙ্গতির উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান আহরণ করা উচিত, এ-বিষয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় সাফাই, কাতাই, কৃষি ও উদ্যান-রচনা, হস্তশিল্প, কলা, সঙ্গীত ইত্যাদিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ, “বুনিয়াদী শিক্ষায় জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা জীবনযাপন-প্রণালীই শিক্ষা দেওয়া হয়।”

গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, ত্যাগেই জীবনের পূর্ণতা। এই অত্যাচার-ক্লিষ্ট দেশে আত্মত্যাগের যথেষ্ট প্রয়োজনও রয়েছে। তাই জনসাধারণের সেবার কাজে তিনি পূর্ণোদ্যমে লেগেছিলেন এবং আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন যে, “আমি সেই ভারত গড়ে তুলতে চাই,

যেখানে দীনতম ব্যক্তিও অনুভব করবে যে, এই তার দেশ এবং যেখানে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ থাকবে না এবং সমস্ত মানুষই জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সম্পূর্ণ প্রীতির ভাবে বাস করবে।"

জনসেবাকে জীবনের ব্রত করতে পারলে, সমাজকে স্বাস্থ্য ক'রে তোলার পক্ষে হয়তো সহায়ক হ'তে পারে। সেন্ট্ পল্ ত্যাগী সন্তদের উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন—"You are the salt of the earth." লবণ ব্যতিরেকে যেমন তরকারির স্বাদ হয় না, তেমনই সেবারত ত্যাগী ব্যক্তি না থাকলে সমাজ মনুষ্য-বাসের যোগ্য হয় না। জগতে এমন ব্যক্তি আছেন ব'লেই তা মনুষ্য-বাসের উপযোগী। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, ত্যাগের দুঃখ যেমন বড়, তার শান্তি এবং মাধুর্য্যও তেমনই বড়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—

"যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে ;
সর্ব্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন।"

গ্রামবাসীর সঙ্গে মিশে, তাদের কথা চিন্তা ক'রে গান্ধীজীর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠেছিল ; তাই তিনি দেশবাসীর শুভ কামনা ক'রে, তাদের উন্নতির জন্যে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। গ্রামের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মতো। অথচ, শহরের প্রাণ-চাঞ্চল্যের পিছনে রয়েছে পল্লীর শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ শক্তির প্রকৃত উৎস। শহর যোগায় ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি ; গ্রাম যোগায় শক্তি ও সম্পদ্। শহরই গ্রামের দিকে এগিয়ে যাবে—ইউরোপের গ্রামের মতো অর্থাৎ শ্যামলাঞ্চলরূপে (Green belt)। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও উপকরণ থাকা দরকার। কিন্তু জীবনের আঘাতে জীবন জেগে ওঠে। তাই মানুষের ওপর অটল বিশ্বাস

রেখে কাজে অগ্রসর হ'লে, ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচিত হবে। সত্যের দীপ-শিখাকে অনির্ব্বাণ রেখে সকলেরই নির্ভয়ে এগিয়ে চলা উচিত।

পরিশেষে, এ-কথা বলতে পারা যায় যে, একটি জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে যেমন কোটি কোটি প্রদীপ জ্বালতে পারা যায়, তেমনি বুনিয়াদী শিক্ষা-দর্শের বীজ কোটি কোটি মানুষের অন্তরে দৃঢ় হয়ে উঠলে সমাজের জীবনে যে মালিন্য ও শ্যামিকা জমে উঠেছে, তা নিশ্চিহ্ন হবে এবং কল্যাণলাভের পথ দেখিয়ে দিয়ে কল্যাণময় পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।

গান্ধীজীর সমাজ-দর্শন

গান্ধীজী ভারতে শ্রেণীহীন, শোষণহীন ও বিকেন্দ্রিত সমাজ-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব কিনা, আলোচনা করা যাক্

দেখা যায় যে, সমাজে এক শ্রেণীর লোক রয়েছেন—যাঁরা বিন্দুমাত্রও কায়িক পরিশ্রম করেন না, অর্থের জোরে অপরকে শোষণ ক'রে কালাতিপাত করছেন। আর একদল উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করেও, দুবেলা পেট ভরে খাবার সংস্থান তাদের হয় না, সংসারের স্বচ্ছলতা কোনদিন তারা আনতে পারে না। একদিকে যেমন অর্থ-প্রাচুর্য্যের জন্যে অপচয়, অপরদিকে তেমনই অভাব-অনটনেও দারিদ্র্য। যে নিজে কিছু না করবে, পরনির্ভরতা তার বাড়বে এবং অপরকে সে শোষণ করবেই। এদের বলা যায়—পরগাছা শ্রেণী। মানুষ যদি নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসের সংস্থান নিজেই করে, তাহলে তার পরনির্ভরতা কমে যায় এবং শোষণ করার প্রশ্নও সেখানে ক্রমশঃ অবান্তর হয়ে পড়ে।

কেউ কেউ রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশের উদাহরণ দিয়ে, আমাদের দেশকেও সেইভাবে গড়ে তোলবার কথা বলেন। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখতে হবে যে, ঠিক ঐভাবে আমাদের দেশকে গড়ে তোলা সম্ভব কিনা।

এ-কথা সত্য যে, ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সেখানে জিনিসের আয়োজন যেমন বেশী, লোকও তেমনি নিযুক্ত হচ্ছে। বেকার-সমস্যা সে-সব দেশে প্রকট নয়। বরং, কল-কারখানা, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি বিদ্যার্থীদের প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে এনে কাজ দেয়। আমেরিকার শিক্ষা এতই উন্নত যে, শোনা যায় সেখানে নাকি মোটর-চালকদের মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারীদের দেখতে পাওয়া যায়। সকলকেই লেখাপড়া করতে হবে এবং সকলেই সব কাজ করবে। কোন কাজই হেয় নয়। সেখানে চাষীরও একাধিক উড়োজাহাজ বা মোটরগাড়ী আছে। আমাদের দেশে এ-সব কল্পনাও করা যায় না। জার্ম্মানী এক সময় পশ্চাৎপদ্ দেশ ছিল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা উন্নত হ'তে পেরেছে। তারা এক সময় ফরাসীদের খুব অনুকরণ করেছিল ; ফরাসী ভাষায় কথা ব'লে গর্ব্ব অনুভব করতো। কিন্তু, পরে তারা মাতৃভাষায় অসাধারণ উন্নতি করেছে এবং কারিগরী শিক্ষায় শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম ব'লে বিবেচিত হয়েছে। জাপান অত্যল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক উন্নত হয়েছে।

কিন্তু ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। জমির অনুপাতে লোকসংখ্যাও আমাদের দেশে অনেক বেশী। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ শিল্পপ্রধান দেশ ; আমেরিকা বা রাশিয়ার জমির মাথা-পিছু হার ১৪ থেকে ১৭ একর, জমির তুলনায় মানুষ ওদেশে কম। ভারতে মাথা-পিছু জমির পরিমাণ মাত্র ৩।৪ একর ; ভারত পৃথিবীতে একটি ঘন-বসতিপূর্ণ দেশ। সুতরাং এদেশের সমস্যা অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক। রাশিয়া যদি ট্রাক্টর ব্যবহার না করে, তাহলে তার জমি শুধু কোদাল চালিয়ে সম্পূর্ণভাবে চাষ করা যাবে না ; অনেক জমিই অনাবাদী থাকবে। অপরপক্ষে, ভারতে ট্রাক্টর চালালে বেকার-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। কারণ, ট্রাক্টরে স্বল্প লোক বহু-সংখ্যক লোকের কাজ করবে। উপরন্তু, ভারতের জমি এত ক্ষুদ্র ও বিচিত্র-ভাবে বিভক্ত যে, যৌথভাবে হ'লেও চাষ করা দুঃসাধ্য।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—কৃষিকাজে লোক-সংগ্রহের জন্যে কিছুকাল আগেও আমেরিকায় কি অমানুষিক

অত্যাচারই না হয়েছে! যখন শিল্প-বিপ্লবের পত্তন হ'ল, তখন ইংল্যাণ্ডে ল্যাঙ্কাশায়ারে সুতো কাটার কারখানা খুব বেড়ে উঠলো। আমেরিকার উত্তর অঞ্চল ছিল শিল্পপ্রধান, সেখানে নতুন যুগের কল-কারখানা বেড়ে উঠলো; দক্ষিণ অঞ্চলে বড় বড় কৃষিকাজের জমি ও বাগান ছিল। সেখানে ক্রীতদাস খাটিয়ে কাজ হ'ত। অতএব যুক্তরাষ্ট্রে তখন আরও বেশী ক্রীতদাসের প্রয়োজন হ'ল; কারণ ল্যাঙ্কাশায়ারের কারখানাতে যে সুতো কাটা হ'ত তার তুলো আসত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের বাগানগুলি থেকে। তুলোর বাগান বেড়ে চললো, আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাসদের যে ভাবে ধরে আনা হ'ত, সে অতি মর্ম্মন্তুদ ও করুণ কাহিনী।

যাই হোক, আরও কয়েকটি দিকও আমাদের ভাবতে হবে। পরিকল্পনা যতই করা যাক না কেন, অর্থ না থাকলে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ভারতের নিজস্ব পুঁজি শিল্পোন্নয়নের জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়। বড় বড় শিল্প-কারখানা হ'লে চিন্তার বিষয়ও আছে! প্রথমতঃ, অর্থ কোথা থেকে পাওয়া যাবে; দ্বিতীয়তঃ, কাঁচামাল সরবরাহ-ব্যবস্থা ঠিকমতো আছে কিনা দেখতে হবে; তৃতীয়তঃ, যন্ত্রশিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অপসারণ বা অনাবশ্যকতা অনিবার্য্য; চতুর্থতঃ, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার। পশ্চিম ইউরোপ এককালে যেভাবে শিল্পীকরণ ক'রে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, আজ তার নির্ব্বিচারে অনুকরণ করার কথা চিন্তা করা বিচার-বুদ্ধির অভাবের পরিচয়। ভারতের জিনিস নিকৃষ্ট শ্রেণীরও বটে। পঞ্চমতঃ, অতীতের বনিয়াদের ওপর ইমারত তৈরি করলে, তা নাগরিকদের নর্ম্মভূমি হয়। তাই, যেহেতু ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, তার পরিকল্পনাও সেইভাবে করা দরকার।

কোনও শিল্পোৎপাদনের জন্যে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা ঠিকমতো থাকা চাই। পৃথিবীর মধ্যে পাটের প্রায় সবই উৎপন্ন হয় পূর্ব্ববঙ্গে। সুতরাং সেখান থেকে পাট সরবরাহ বন্ধ হ'লে, পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলিরও একে একে তালা বন্ধ ক'রে রাখতে হবে। চিনির কল করতে গেলেই আখের চাষ হয় কিনা বা নিয়মিত আখের সরবরাহ হয় কিনা, দেখতে হবে। আবহাওয়া এতদুপযোগী না হ'লে, ইচ্ছা থাকলেও জোর ক'রে

ফসল ফলানো যাবে না। দার্জ্জিলিংয়ের চায়ের চাষ আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও ক'লকাতায় করা সম্ভব নয়। স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হওয়ার ফলে বহু কর্ম্মীকে অপসারিত হতে হয়েছে। এইভাবে দেখা যাবে যে, প্রতি ক্ষেত্র থেকেই মানুষ অপসারিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এই যে, এই উদ্‌বৃত্ত লোক শেষ পর্য্যন্ত যাবে কোথায়? এছাড়া, যে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হবে, অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তা টিকে থাকতে পারবে কিনা, তা-ও দেখতে হবে। অর্থনীতির আরও কয়েকটি দিক আছে, যা আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, এইভাবে সমস্যার স্থায়ী সমাধান কখনই সম্ভব নয়।

অবশ্য, বৃহৎ যন্ত্রশিল্প আমাদের দেশে রাখতেই হবে; যেমন—রেল-ইঞ্জিন, উড়োজাহাজ ইত্যাদি। যেখানে বিদ্যুৎ আছে, সেখানে তার সুযোগও গ্রহণ করতে হবে। লোহা আমাদের দেশে প্রচুর আছে, কয়লাও কম নেই। অথচ শিল্পের তেমন কোন প্রসার হয়নি। কুটীরশিল্পের ওপর আমাদের খুব বেশী জোর দিতে হবে। প্রয়োজন হ্রাস করতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন যে, চরকায় সুতো কাটলে মানুষের শক্তিকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া হবে; কিন্তু অম্বর চরকা, তাঁত ও কুটীরশিল্পে আমাদের দেশের উৎপাদন অনেক বাড়বে। অম্বর চরকার প্রবর্ত্তন হ'লে কুটীরশিল্প দ্বারা মানুষ বস্ত্র-স্বাবলম্বী হ'তে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে কুটীরশিল্প এতই উন্নত যে, ঘড়ি তৈরিও কুটীরশিল্প।

ক্ষমতা যেখানেই কেন্দ্রীভূত হয়, সেখানেই দুর্নীতি, শোষণ-পীড়ন প্রভৃতি অনিবার্য্যভাবে এসে পড়ে। ভারতের কাপড়ের কলগুলির অধিকাংশই আমেদাবাদে। ঐ কলগুলির মালিকরা একজোট হয়ে অনায়াসে নানা কৌশলে লোককে শোষণ করতে পারে এবং করছেও। সাধারণ মানুষ তাদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র হ'য়ে আছে। কাপড়ের কলের আয় অধিকাংশই মুষ্টিমেয় মিল-কর্ত্তৃপক্ষের পকেটস্থ হয়। ক'লকাতার জল-সরবরাহ-ব্যবস্থা পলতা জলকল থেকে হয়। কোনও কারণে হঠাৎ ঐ জল-সরবরাহ বন্ধ থাকলে সারা শহরের অসংখ্য নরনারীর কি দুর্দ্দশা হ'তে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

দেশের এই অবস্থা গান্ধীজীকে উদ্বেল ক'রে তুলেছিল। তিনি স্থায়ী

সমাধানের কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর মতে, প্রত্যেককে নিজের জীবিকা অর্জ্জনের জন্যে সাধ্যমত পরিশ্রম করতে হবে। তাহ'লে কোন কাজ হেয় প্রতিপন্ন হবে না। শহর ও গ্রামের মধ্যে যে বৈমাত্রেয় ভায়ের সম্বন্ধ আছে, তা আর থাকবে না। বর্ত্তমান সামাজিক নিরাপত্তার নিকৃষ্টতম পরিণতি থেকে দেশ দূরে থাকবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে বিষময় সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছে, তা লোপ পাবে। কায়িক ও বুদ্ধিজীবী শ্রমের প্রভেদ থাকবে না এবং নিষ্কর্ম্মা ও শ্রমিকের বিরোধ বা ব্যবধান লোপ পাবে—উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের সেতু রচিত হবে। সকলেই একযোগে কাজ করবে। ব্যষ্টিকে নিয়ে সমষ্টি—তাই একদিন দেখা যাবে যে, দেশের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কৃষিকাজ করতে হবে, কাউকে বসিয়ে রাখা চলবে না। সমাজে থেকে মানুষ যেমন উপকৃত হবে, তেমনিই থাকবে নাগরিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। এই সামাজিকতাবোধ প্রত্যেকেরই অবশ্য থাকা উচিত।

দেশে যেমন কুটীরশিল্প থাকবে, তেমন বৃহৎ যন্ত্রশিল্পেরও প্রয়োজন হবে। বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র হ'লে কাজের অনেক সুবিধা হবে; সে ব্যবস্থাও থাকবে। সর্ব্বোপরি, বিকেন্দ্রিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে হবে।

কোনও জন-সমাজের জল-সরবরাহের ব্যবস্থা দু'ভাবে হ'তে পারে। এক স্থানে জল সংগ্রহ ক'রে, কলের সাহায্যে প্রতি গৃহস্থের বাড়ী সেই জল পৌঁছে দেওয়া যায়। আর, প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে কূপ বা অনুরূপ ব্যবস্থা দ্বারাও জল-সরবরাহ সম্ভব। কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত ভালো, তা আমাদের বিচার ক'রে গ্রহণ করতে হবে। পরিশেষে বলতে হয় যে, বাস্তব কখনও আদর্শের মতো হ'তে পারে না—কাছাকাছি যেতে পারে মাত্র। গান্ধীজীও এ-কথা বুঝতেন; তাই তিনি বলেছেন—"আমার 'রাম-রাজ্য' বাস্তবে কখনই সম্ভব নয়। রাম-রাজ্য মানবীয় আদর্শের একটি আদর্শ রূপ, তা কোনদিন লাভ করা যাবে না। কিন্তু তা লাভ করার জন্যে চির-প্রয়াসই হ'ল মানুষের কার্য্য। আদর্শ যদি কোনদিনও সফল না হয়, তাতে কিছু যায় আসে না; কারণ সৎ-প্রয়াসী মানুষই একটি সুন্দর কল্যাণের রূপ।"

বুনিয়াদী শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

দর্শন শব্দের একাধিক অর্থ আছে। তার মধ্যে একটি হ'ল—চিন্তা-পদ্ধতি দ্বারা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে, মননের আনুকূল্যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সাহচর্য্যে পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ ক'রে ভাষায় প্রকাশ ও এই প্রণালীতে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা।

শিক্ষার অবশ্যই দর্শন থাকে; তাই, নঈ তালিমেরও দর্শন আছে। কোনও ব্যক্তি সত্যকে উপলব্ধি করলে, তিনি আদর্শের পিছনে ধাবিত হন এবং কোনও বস্তুর ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হয়; অর্থাৎ, সহজভাবে বলা যায় যে, কোনও বিষয়ের পরিণাম সম্বন্ধে তাঁর চূড়ান্ত ধারণা হয়। একেই আমরা বলতে পারি দর্শন। কোনও শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ হ'তে পারে, কিন্তু দর্শন তাঁদের পথ ব'লে দিতে পারবে। অথবা, বলতে পারা যায় যে, শিক্ষা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হ'লে তার সমাধান হবে দর্শনে।

সক্রেটিস্ থেকে ডিউই এবং যাজ্ঞবল্ক্য থেকে গান্ধীজী পর্য্যন্ত শিক্ষার দর্শন প্রচারিত হয়েছে। সক্রেটিস্, প্লেটো, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, রুশো, জর্জ্জ বার্নার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েল্স্, বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল, আলডুস্ হাক্সলি, জন ডিউই, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতি শিক্ষার দর্শন প্রচার করেছেন। প্লেটো বলেছেন—"He who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be justly termed a philosopher. He is "a lover, not a part of wisdom, but of the whole." His desire is to "see life steadily and see it whole." ডিউই বলেছেন—"Whenever philosophy has been taken seriously it has always been assumed that it signified achieving a wisdom that would influence the conduct of life." আলডুস্ হাক্সলি বলেছেন—"Men live in accordance with their philosophy of life, their conception of the world." স্যার জন্ অ্যাডাম্স্ বলেছেন—"Education is

the dynamic side of philosophy." অর্থাৎ, শিক্ষা হ'ল দর্শনের গতিশীল দিক। জেম্‌স্ রস্ বলেছেন—দর্শন এবং শিক্ষা একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো ; প্রথমটি চিন্তা এবং পরবর্ত্তীটি ক্রিয়ার দিক। "Philosophy and education are like the two sides of a coin ; the former is the contemplative side, while the latter is the active side. Education is the influence of a person who holds a vital belief brought to bear on another person with the object of making him also hold that belief." Zentile বলেছেন—"To understand the precise nature of education, we must know the nature of outlook."

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার দর্শন হ'ল জীবনের দর্শন। ইহা জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের দিক। দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। দর্শন শিক্ষার ওপর তার রূপদানের জন্যে এবং শিক্ষা তার পথ-প্রদর্শক হিসাবে দর্শনের ওপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় দর্শন—বহু দার্শনিকের মতে, ভারতীয় দর্শন দুঃখ ও নৈরাশ্যের দর্শন। ইহা দুঃখবাদ প্রচার করে। জাগতিক জীবনে যে দুঃখ আছে, ইহা ভারতীয় দার্শনিক অস্বীকার করেননি। বুদ্ধ বলেছেন, জীবমাত্রই জরা মরণের অধীন। সাংখ্যকার বলেন, জীব ত্রিতাপে তাপিত। যোগ-শাস্ত্রকারের মত—জীব সদা পঞ্চ ক্লেশে ক্লিষ্ট। চার্ব্বাক ছাড়া অন্যান্য দার্শনিকও স্বীকার করেছেন যে, জীব জগতে বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে এবং এই অবস্থায় কখনও অনাবিল সুখশান্তি সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখই চরম পরিণতি, ইহা কোন ভারতীয় দার্শনিক স্বীকার করেননি। দুঃখের কথা ভারতীয় দর্শনের আদি কথা, ইহা শেষ কথা নয়। ভারতীয় দর্শনের শেষ কথা আশা ও আনন্দের। তাঁরা বলেছেন—অবিদ্যাই সকল ক্লেশের মূল। জ্ঞান থেকে মুক্তি অর্থাৎ দুঃখত্রাণ। জ্ঞান থেকে ধর্ম্মাচরণ এবং ধর্ম্ম থেকে আবার সুখ। মোক্ষলাভের উপায় হ'ল—"সম্যক্ দর্শন—জ্ঞানচারিত্রাণিঃ মোক্ষমার্গঃ।" উপনিষদের ধ্বনি—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" ইত্যাদি।

ভারতীয় দর্শন ছাড়া অন্য কোন দর্শন আর্ত্ত মানবকে এমন আশার বাণী শোনায়নি।

ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিকতার দর্শন। চার্ব্বাক ছাড়া অন্যান্যরা কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জীব যেমন কাজ করবে, তেমনি ফলভোগ করবে। সকাম কর্ম্ম জীবের বন্ধনের কারণ। নিষ্কাম কাজে চিত্ত-বিশুদ্ধি হয় এবং ইহা মোক্ষলাভের সহায়ক। চার্ব্বাক ছাড়া সকলেই মোক্ষবাদে বিশ্বাসী। দুঃখের কবল থেকে আর্ত্ত মানবকে উদ্ধার করবার চেষ্টা থেকে ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি। তাঁরা দেখেছেন—অজ্ঞানতা দুঃখের কারণ। সৎকর্ম্ম-সম্পাদন ও প্রকৃত জ্ঞানলাভ মুক্তির কারণ। ভারতের দর্শন আশা ও মুক্তির দর্শন।

নৈয়ায়িকগণের মতে—ঈশ্বর এক, অসীম, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব-শক্তিমান ও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। অনন্ত ধীশক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা রয়েছেন ব'লে জগৎ নিয়ম-শৃঙ্খলার সঙ্গে চলছে। তিনি সমগ্র জগতের প্রাণস্বরূপ ও সৎগুণের পরাকাষ্ঠা। তিনি পরম দয়ালু। জীবাত্মা যদিও স্বরূপতঃ অচেতন, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, ঈশ্বর স্বরূপতঃ সগুণ, নিষ্ক্রিয় ও সচেতন।

Philosophy of education is philosophy of life. It is of the goals and ideals of life. Philosophy and education are inter-dependent. Philosophy is dependent upon education for its formulation, while education is dependent upon philosophy for its guidance.

প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার পিছনে একটি লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। সেই লক্ষ্যটিই হ'ল দর্শন। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগ-রূপ হ'ল শিক্ষা। দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে শিক্ষার মাধ্যমে জাতি-গঠনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চায়। বুনিয়াদী শিক্ষার পিছনে এই দার্শনিক তত্ত্ব কাজ করেছে। গান্ধীজীর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল—সত্যের উপলব্ধি, পন্থা ছিল অহিংসা। তিনি সারাজীবন ধরে সত্যোপলব্ধির চিন্তা ক'রে গিয়েছেন, অহিংসার প্রয়োগ ক'রে গিয়েছেন। তিনি শিক্ষাকে অহিংসা ও সত্যের আধারে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই সত্য ও অহিংসা

ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সত্যের উপলব্ধি। সত্য হ'ল সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করার এবং প্রতিটি চিন্তা ও আচরণের মধ্যে তাকে প্রতিফলিত করার বস্তু। আদর্শ জীবন-যাপন এজন্যে দরকার। কথাবার্ত্তা, চিন্তা, ভাবনা, আচার, আচরণ, উদ্দেশ্য প্রভৃতির শুদ্ধতা ও আন্তরিকতার ওপর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য সত্য নির্ভর করে। অহিংস উপায়ে গান্ধীজী এ পেতে চেয়েছেন। গান্ধীজী বলেছেন—"Ahimsa means infinite love, which again means infinite Capacity for Suffering." তিনি আরও বলেছেন —"কোন ব্যক্তির ভিতর অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হ'লে তার কাছে যে আসে তার মন থেকে শত্রুভাব বা বিদ্বেষভাব দূর হয়ে যায়। পাতঞ্জল দর্শনের এই অহিংসাই আমার কাম্য। এখানেই অহিংসার চরম সার্থকতা।" "সর্ব্ব প্রদানেষু অভয়প্রদানম্"—সমস্ত মানব-জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা। তা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞান-ঘন। এই মহাত্মাজীর জীবন-দর্শন।

গান্ধীজীর মতে—সত্যই ভগবান। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অদৃশ্য এক মহাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাঁকে লাভ করতে হয় অহিংস উপায়ে। অহিংসা উপায়মাত্র, সত্যই লক্ষ্য। সূর্য্যকিরণ যেমন সকলের ওপর সমানভাবে পতিত হয়, এই জগতের সব মানুষই তেমনই সমান; এখানে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। তাঁর আদেশ ব্যতীত এই বিশ্বের একটি তৃণও নড়ে না। মানুষ জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, সেই পরম সত্তাকে উপলব্ধির জন্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে। একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, এই জগৎ মায়া।

গান্ধীজী নিজে যেমন নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, তেমনই মানুষের কাছ থেকেও তিনি সততা আশা করেছিলেন। সত্য এবং অহিংসাকে তিনি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো মনে করতেন। এদের একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করা অসম্ভব। এইজন্যে তিনি বলেছেন যে, লক্ষ্য স্থির থাকলেই যে পৌঁছানোর পথ নিষ্কলুষ হবে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এ-কথাও তিনি বলেছেন যে, কোনও কাজের উদ্দেশ্য কি, তা দেখে সে সম্বন্ধে বিচার করতে হবে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গান্ধীজী নিজে যেমন উচ্চ জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনই অন্যেও তাঁর মতো হবে—এ-কথা তিনি মনে করতেন। তাঁর নই তালিমের শিক্ষা-দর্শনও এই জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত। তাই, তিনি সমাজের পরিবর্ত্তিত রূপের কথাও এই সঙ্গে চিন্তা করেছিলেন।

আচার্য্য জে. বি. কৃপালনী বলেছেন—"Basic education stands or falls by its philosophy of life, individual and social··· Gandhiji looked to education as the means for establishing the social order of his conception. You may accept the education without the social programme, because, like all other means which he had used, it is good in itself. But if you isolate it from its social philosophy, it cannot proper long ; it is cut off from its roots."

বুনিয়াদী শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর সর্ব্বতোমুখী বিকাশ—অর্থাৎ, তার দেহ, মন ও আত্মার বিকাশ-সাধন। আধুনিক কালে এ-কথা স্বীকৃত হয়েছে যে, শুধু বই পড়লে শিশুর এই সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই প্রগতিশীল দেশে শিক্ষাকে কর্ম্মকেন্দ্রিক করা হয়েছে। তার দেহের বিকাশের জন্যে কাজ দরকার ; এই কাজের মধ্য দিয়েই শিশু তার কান, চোখ, হাত, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বিকাশলাভের সুযোগ পায়। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা পায় ব'লে, তা তার জীবনের মহামূল্য সম্পদ্ হয়ে থাকে। শুধু বিদ্যার্জ্জন তার হবে না, সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতাও হবে খুব বেশী। মামুলী শিক্ষার মতো উপাধিধারী হয়ে সে চোখে সর্ষে ফুল দেখবে না। নিজের কাজ নিজে করতে পারবে। এইভাবে কাজের মাধ্যমে শিশু যে জ্ঞান পাবে, তা সে জীবনে কখনও ভুলবে না।

কাজ করার ফলে শিশুর অন্য কয়েকটি দিকেও বিকাশ হবে। তন্মধ্যে একটি হ'ল—মনের একাগ্রতা। এছাড়া, তার ধৈর্য্য, সহনশীলতা ইত্যাদিও বৃদ্ধি পাবে। তার সৃজনী-শক্তিও দিন দিন বাড়বে। কারণ শিশু কোনও একটি কাজে আনন্দ পেলে পুনরায় নতুন একটি কাজে নামে—এইভাবে সৃষ্টির আনন্দ তাকে নব নব কাজের প্রেরণা যোগায়।

বেকন, মণ্টেন, লক প্রমুখ দার্শনিকরা বাস্তব ও প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার বিরুদ্ধে বলেছেন। রুশো বলেছেন—"Children are first restless and curious." রুশোর পর পেস্টালজি, হার্ব্বার্ট, ফ্রয়েবেল, মণ্টেসরি, ডিউই প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌রা কাজের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গঠনমূলক কাজে ছেলেরা প্রবৃত্ত হবে। আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা এতে হয়। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুর চারটি 'H'-এর চর্চ্চা হয়—Health, Hand, Head এবং Heart.

শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল ব'লে সব সময়েই সে বৈচিত্র্য খোঁজে। কয়েকজন শিশু একত্র হ'লেই নানাভাবে খেলা ক'রে থাকে। যে কাজে সে আনন্দ পায়, তাতে তার কৌতূহল বা আগ্রহও বেশী। এছাড়া মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, হাত শিশুর মস্তিষ্ক-বিকাশে সাহায্য ক'রে থাকে। এই কারণে, কোন্ বয়সের শিশু কি কাজ করতে পারে, তার নির্দ্দেশও তাঁরা দিয়েছেন। একেবারে শিশুদের জন্যে অর্থাৎ ৬।৭ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্যে অনির্দ্দেশিত কাজের কথা তাঁরা বলেছেন। একে স্বৈচ্ছিক কাজ বলা হয়। একটু বড় শিশুদের জন্যে নির্দ্দেশিত কাজ হবে।

গান্ধীজীও তাই বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের কথা বলেছেন। উপরন্তু, জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য কাজের ওপর জোর দিয়ে তিনি সৌখিন কাজ বা শিল্পকাজকে নিষ্ঠুরতা ব'লে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। যে দেশের শিশু ধারাপাত কিনতে অপারগ, তাদের দিয়ে বিদেশের অনুকরণে Turkish Towel দিয়ে খরগোশ, কুকুর ইত্যাদি তৈরি করতে শেখানো তিনি নিষ্ঠুরতা মনে করেছেন। যাই হোক, এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, কাজ করতে গিয়ে শিশুর পেশীর অনুভূতিলাভ ঘটে এবং তার অভিজ্ঞতাও দৃঢ় হয়। এই কারণেই গান্ধীজী বলেছিলেন যে, শিশুর উৎপাদন-ক্ষমতা

যখন কার্য্যকর হবে, তখন সে লেখাপড়া শেখার উপযুক্ত হবে। স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, গান্ধীজী চেয়েছিলেন জ্ঞানলাভ এবং উপার্জ্জন একই সঙ্গে চলতে থাকবে। "Education in the Gandhian spirit will free them from hatred and fear and create in them ingrained habits of truth, non-violence and adoption of pure means in both individual and group acts."

বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশু হাতে-কলমে কাজ করে এবং সেই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞাতব্য বিষয় সে জেনে নেয় আনন্দচিত্তে। একেই বলে কাজের শিক্ষা (Learning by doing)। উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজ (purposive work) করায় শিক্ষার্থী পেশী সঞ্চালনের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিও সঞ্চালিত করতে শেখে। আত্ম-প্রতিষ্ঠা নির্ম্মাণ, যূথবদ্ধতা প্রভৃতি মনের অনেক সহজাত প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই উদগতিলাভ করে। হস্তসম্পাদ্য কারুকলা চর্চ্চার ফলে শিশু-মনে সৃজনী-প্রতিভার (creative urge) উন্মেষ ঘটে এবং আত্ম-বিকাশ (self expression) সম্ভব হয়। যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য আত্ম-বিশ্বাস, পন্থা আনন্দময়, পদ্ধতি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়, তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগিতা অনস্বীকার্য্য।

মনের সঙ্গে কাজের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই কারণে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে প্রতিদিন সৃজনাত্মক কাজ করার কথা বলা হয়েছে। শিশুর অনুভূতি এতে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পাবে। বিভিন্ন প্রকার স্বভাবের ছাত্রের জন্যে নানারকম কাজের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষাবিদ্‌রা কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত ব'লে মনে করেছেন—তাই এই ব্যবস্থা। এক কথায় বলা যায় যে, গান্ধীজী শিশুর মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, জৈবিক ও অর্থনীতিক দিকের কথা চিন্তা ক'রে বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্ম্ম ও শিল্পকাজকে স্থান দিয়েছেন এবং সেইমতো নির্ব্বাচন করেছেন।

"Practice in the skill is the beginning of the development of the 'mind'—to be exact the brain, for it is with the brain that we think. In a real way 'the hands are the eyes of the brain.' Every finger or hand co-ordination

means a brain connections—the more types the skill the more connections—hence the more ability to think"—Jay B. Nash.

"কাজের মাধ্যমে শিক্ষা"*—এই নীতি গ্রহণ করার ফলে শিশুর বৌদ্ধিক বিষয়ের জ্ঞানলাভের সঙ্গে তার আত্মিক বা চারিত্রিক উন্নতিও হবে—তার আত্ম-প্রত্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'লে এই আত্ম-প্রত্যয়ের মূল্য অসীম। একটি সুষ্ঠু সমাজ-জীবনও বিদ্যালয়ের নানাপ্রকার কাজ একত্র করার ফলে গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, শিশু কাজের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে।

শিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ের গড়া কৃত্রিম সামগ্রী ক'রে তুললে, তার অনেকখানি আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়। জীবন আরম্ভের সুদীর্ঘ কাল প্রতিদিন মনক্লিষ্ট হয়ে তার স্বাভাবিক শক্তি যে কত নষ্ট হয়, তার হিসাব আমরা স্পষ্ট আকারে দেখতে পাই না ব'লেই বুঝতে পারি না। তাই, ছাত্ররা যেন বিদ্যাশিক্ষাকে তাদের অখণ্ড প্রাণ-প্রকৃতির ও মনঃ-প্রকৃতির বিচিত্র লীলার অঙ্গরূপেই গ্রহণ করতে পারে। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে শিশু-জীবনের আন্তরিক যোগ-স্থাপনের প্রচেষ্টা দরকার। গাছপালা ও পাখীর বিষয়ে প্রাত্যহিক জ্ঞানের দিক, তাদের প্রতি দৈনন্দিন সেবার দিক, লোকালয়ের সঙ্গে যোগসাধন, সামাজিক রীতিনীতি পালন, শিক্ষক, গুরুজন, সতীর্থ ও ছাত্রদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার, অতিথি-সেবা, সময়ানুবর্ত্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য্য-শিক্ষা ইত্যাদি তারা শিখবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাশিক্ষায় আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবে এ-কথাই খাঁটি। কিন্তু পুঁথিপড়া মানুষই যে পুরা মানুষ তাহা বলা যায় না। অথচ এ সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যাবিভাগের লজ্জা নাই। তাই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে আমাদের কানে এই মন্ত্র দিয়া আসিয়াছে যে, ভদ্রলোককে পুরা মানুষ হইতে হইবে না। ভদ্রলোকের চোখ ভাল করিয়া দেখিতে শিখুক, কান ভাল করিয়া শুনিতে না শিখুক, হাত ভাল করিয়া কাজ করিতে শিখুক। তাহাতে কোন অগৌরব নাই, কেবল যেন সে পড়িতে

* **কাজের মাধ্যমে শিক্ষা**—শ্রীঅমরনাথ রায়।

শেখে। আমাদের মতে পঙ্গুতাই ভদ্রসমাজের লক্ষণ। হাত-পাগুলোকে অপটু করিয়া তুলিলে ভদ্রতা পাকা হয়। ইহার ক্ষতি ততদিন বুঝিতে পারি নাই, যতদিন বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষলাভ ছিল চাকরীধামে, কেরানীতীর্থে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতে দেখা গেল। তাহার মত অসহায়প্রার্থী আর জীবলোকে নাই। সংসার-সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সঙ্কটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুইদিকেই শক্ত হইতে হইবে। এই তাগিদ আসিয়াছে।”

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিশুর সর্ব্বতোমুখী বিকাশের কথা চিন্তা করে বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের অবতারণা করা হয়েছে। তার মানসিক প্রচয়ের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি দিকেরও বিকাশ হওয়ার ফলে সে প্রকৃতই একজন কর্ম্মী তথা সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠছে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্ম্ম

কোন কিছু করাকে কাজ বলে। বুনিয়াদী শিক্ষায় এই কাজ শিশুর বিকাশের পক্ষে পরম সহায়ক। সুস্থ শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল। এই বিশ্বের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ সব কিছুই শিশুর আকর্ষণের বস্তু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সে সব সময়েই জানতে চায়। এ বিষয়ে তার অদম্য কৌতূহল রয়েছে। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা এই আগ্রহকে প্রকাশ করে। সে যেন একটি জীবন-জিজ্ঞাসা। মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করে থাকে। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে মনোমন্দিরের দ্বার বলা হয়। শিশু তার জ্ঞানলাভের সময় যত বেশী এই ইন্দ্রিয় ব্যবহার করবে, তার জ্ঞান তত দৃঢ় হবে। এই জন্যে কাজের মাধ্যমে শিশুশিক্ষা মনোবিজ্ঞান-সম্মত।

শিশুর পেশীর অনুভূতি থেকে তার বস্তুজ্ঞান জন্মে। চুপ করে তাকে শ্রেণীতে বসিয়ে রাখলে তার ক্ষতি হয়। শিক্ষা তার কাছে বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়েমীতে পরিণত হয়। কাজ করতে দিলে তার শরীর পুষ্টিলাভ ত

করেই, সেই সঙ্গে তার মানসিক প্রচয়ও যথাযোগ্যভাবে পুষ্ট হয়। সেইজন্য ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশে কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশেও শিক্ষায় কর্ম্মকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিশুর কাছে তা স্বাভাবিক মনে হবে। তবে বিদেশে কার্য্য-সমস্যা প্রণালী (Project Method) প্রভৃতির মাধ্যমে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে তার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বিদেশের Activity School এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ—উভয়ই কাজ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হয় না। ফলে, বিদেশের শিল্পসহ শিক্ষা আর আমাদের দেশে শিল্পের-মাধ্যমে শিক্ষা এক নয়।

একথা ঠিক যে কাজের মাধ্যমে শিশু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে বলে তার জ্ঞানলাভ স্থায়ী হয়। রুশো থেকে আরম্ভ করে অনেক শিক্ষাবিদ্ই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ইত্যাদির কথা বলেছেন।

গান্ধীজী যেমন কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলেছেন, তেমন তিনি শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার কথাও বলেছেন। ইংলণ্ডে শিক্ষা ব্যবস্থায় কাজ ও অভিজ্ঞতা (activity and experience)-র কথা বলা হয়েছে। কর্ত্তব্যপালন না করলে শিশু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক হতে পারবে না। আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই বলেছেন যে শিশুশিক্ষার চরম পথ হল ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

কর্ম্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে নানারকম কাজ, শিল্পকাজ, অভিনয়, খেলাধূলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে বলে শিশুর রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার সুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে। পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বল লাভ করে। দেহের দ্বারা আমরা যে সব কাজ করতে পারি, সেই সব কাজের চর্চ্চা করতে হবে—তাতে দেহ সুশিক্ষিত ও সুগঠিত হয় এবং তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়। সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের

সহায়তা ঘটে। এইসব দৈহিক কৃতিত্ব-চর্চ্চায় মনও সজীব হয়ে ওঠে। যেসব ছেলেকে আমরা নির্ব্বোধ বলে মনে করি, তাদের অনেকেরই সুপ্ত চিত্ত এই দৈহিক কর্ম্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়। তাছাড়া, যার দেহ শিক্ষিত হয়নি, সে যত বড় পণ্ডিতই হোক, সংসার ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবনধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ, এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে বাঁচাতে হবে। শিশু তার ঈপ্সিত বিষয় পেয়ে মনে অপার আনন্দ অনুভব করে থাকে। শিশু তার সৃজনীশক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয় এবং পুলক অনুভব করে। প্রচলিত শিক্ষায় শিশু নিক্রিয় থাকে বলে এসবের কোনও সুযোগ থাকে না।

গান্ধীজী বলেছেন, "গ্রাম্য কুটিরশিল্প, (যথা—সূতাকাটা, তূলা ধোনাই করা ইত্যাদি) মারফৎ প্রাথমিক শিক্ষা দেবার আমি যে পরিকল্পনা করেছি, তাকে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এক নিঃশব্দ সমাজ বিপ্লবের অগ্রদূত বলে মনে করা যেতে পারে। এর ফলে গ্রাম ও সহরের মধ্যে এক সাবলীল নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। আর আধুনিক সমাজের বিপদ্-সঙ্কুল অবস্থা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরাজিত বিষাক্ত সম্পর্ক দূর করার পথে বহুল পরিমাণে এ সাফল্য অর্জ্জন করবে।"

গান্ধীজী আরও বলেছেন, "আমার মতে একমাত্র কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তন দ্বারাই দেশের দুর্গতি দূরীকরণ সম্ভব। আমার নিজের এ সম্পর্কে কতক অভিজ্ঞতা আছে ; দক্ষিণ আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্ম্মে আমি নিজের ও অন্যের সন্তান-সন্ততিকে কাঠের কাজ, জুতা তৈরীর কাজ ইত্যাদি হাতের কাজের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা পরিবেশন করেছি। আর আমি সুনিশ্চিত বলতে পারি যে, আমার ও অন্যের সেই ছেলেমেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুই হারায়নি। আজ দেশে দক্ষ ছুতোর, কামার অধিকাংশ পল্লীতে পাওয়াই দুষ্কর। আজ দেশ ও পল্লীর শিল্প মৃতপ্রায়।" তাই শিক্ষাতাত্ত্বিক দিক (Pedagogical aspect) থেকে আমরা দেখি, যে শিশু বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে, তার পেশী, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের চর্চ্চা হয়।

এখানে বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হচ্ছে ;—

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ও কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি—বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ও কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি এই উভয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল আছে। উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী হাতে কলমে কাজ করে বলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় এবং নির্দ্দিষ্ট কাজকে মাধ্যম করে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। মানুষ সামাজিক জীব ; সে উত্তর-জীবনে অবশ্যই সমাজ-জীবন যাপন করবে। তাই, তদুপযোগী অভিজ্ঞতালাভের ব্যবস্থা রাখবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

কিন্তু, উভয় শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যও আছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। একটি প্রধান বা মূল শিল্প (যেমন, কাতাই বা বাগানের কাজ) এবং তার সঙ্গে একাধিক সহযোগী শিল্প (যেমন, দারুশিল্প, তালপাতার আসন তৈরী, চর্ম্ম-শিল্প ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট থাকে। ইহাদের কেন্দ্র করে অবিভাজ্য পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় এমন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। গান্ধীজী নঈ তালিমে উৎপাদনাত্মক কাজের কথা বলেছেন এবং এর ওপর খুব জোর দিয়েছেন। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করে তাকে এই শিল্প যেমন, বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বন ও কাজ করতে বলা হয়।

কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর সমসাময়িক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে কাজ করা হয়। গান্ধীজী বলেন যে, বর্ত্তমানে যেরূপ যান্ত্রিকভাবে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিল্পকে আরও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অর্থ এই যে, ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থী যে কেবল শিল্পের প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে দক্ষতা অর্জ্জন করবে, তা নয়। শিল্পের ইতিহাস ও জাতীয় জীবনে উহার প্রভাব সম্পর্কেও তাকে জ্ঞানার্জ্জন করতে হবে। শিক্ষার্থীর মন ও পরিপূর্ণ আত্মার বিকাশ এইভাবেই সম্ভব। হস্তের অর্থাৎ কর্ম্মের সাহায্যেই বুদ্ধির বিকাশ সাধন করা দরকার। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রত্যেকটি কাজের সামাজিক উপযোগিতা আছে, কিন্তু কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় তা নাও

থাকতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ উদ্দেশ্যামূলক

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ও প্রজেক্ট-পদ্ধতি—এই উভয় পদ্ধতির কাজের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই বিদ্যমান। উভয় শিক্ষা-পদ্ধতিতেই কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এই কাজ বাছাই করা বা নির্ব্বাচনের সময় বাস্তব জীবনের কথা চিন্তা করা হয়। হস্ত-সম্পাদ্য কর্ম্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান করা হয়। কিন্তু তত্ত্ব ও পদ্ধতি—এই দু'দিক থেকে পার্থক্য প্রচুর। প্রজেক্টে শুধু শিশু-মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব থাকে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিল্প-কর্ম্ম বেছে নেওয়া হয়। প্রজেক্টে কেন্দ্রীয় বিষয় বা কাজ শিক্ষার্থী ঠিক করে, বুনিয়াদী শিক্ষায় আগেই নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। বুনিয়াদী শিক্ষায় আদর্শ নাগরিক তৈরী করার কথা বলা হয়েছে। প্রজেক্টে কিন্তু একথা নেই। প্রজেক্ট-পদ্ধতিতে একটি অসুবিধা এই যে, পাঠ্যসূচীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কাজ করা যায় না। সর্ব্বোপরি, প্রজেক্ট-পদ্ধতিতে কাজের খুঁটিনাটি না জানলেও চলে, কিন্তু বুনিয়াদী শিল্পকাজ ভালভাবে শিখতে হয় এবং কাজও ভালভাবে করতে হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর বিকাশ

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হবার পর কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই শিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কয়েকটি মূল পরিবর্ত্তন যে হয়েছে, তা বোঝা যায়। এতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই কাজে স্বাধীনতা আছে। শিশু কায়িক শ্রমের প্রতি মর্য্যাদা দেয়, সামাজিক উন্নতির জন্যে শিক্ষক ও ছাত্র একত্র কাজ করে। এই শিক্ষার মাধ্যমে দেহ ও মনের পরিপুষ্টি সাধন তো হয়ই, উপরন্তু, তার নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশও হয়। এ শিক্ষা শুধু পুঁথিগত নয়, নানারকম

কাজের ব্যবস্থা এতে রয়েছে। যে সমস্ত কাজ শিশু করে, তা সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত। "কর্ম্মে আছে সৃষ্টির আনন্দ"—একটি কাজ শেষ করার পরই শিশু যে আনন্দ পায়, তা-ই তাকে নব নব সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে ক্রমশঃ বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর দেহের ও মনের সম্যক বিকাশ সাধন হয় এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার সৃজনীশক্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। শিশু বিদ্যালয়ে যে সব কাজ করে, তার কয়েকটির সম্বন্ধে আলোচনা করলেই এই শিক্ষার মাধ্যমে তার সম্ভাবনার বিষয় পরিস্ফুট হবে। প্রথমে সাফাইয়ের কথা ধরা যাক।

গান্ধীজী বলেছেন, "শ্রমের সঙ্গে বুদ্ধির সহযোগিতার অভাব হওয়ায় গ্রামের ওপর অমার্জ্জনীয় অবহেলা উপস্থিত হয়েছে। জাতীয় বা সামাজিক পরিচ্ছন্নতার অভাবে রোগ হয়, রোগ হলে কাজ কামাই হয় এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল দারিদ্র্য। এথেকে আসে সঙ্কীণতা ও আত্মপ্রত্যয়হীনতা; পরিণামে দেখা যায়, সমবেত চেষ্টার অভাব এবং বিদ্যালয় ও পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার ধ্বংস। গ্রামের সর্ব্বনাশের নানা কারণের মধ্যে এটি একটি। নঈ তালিম পরিচ্ছন্নতা বিধান ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করে এই সর্ব্বনাশের স্রোত রুদ্ধ করে। তার ফলে, অজ্ঞতা দূর হয়, গ্রাম পরিচ্ছন্ন হয়, মানুষের স্বাস্থ্য ফিরে আসে, কাজ কামাই বন্ধ হওয়ায় উৎপাদন ও ঐশ্বর্য্য বাড়ে, উদারতা ও আত্মপ্রত্যয় জন্মে এবং শেষে গ্রামের সমবেত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় ও পঞ্চায়েত গড়ে ওঠে। যদি জাতির আশা-ভরসা শিশুদের শিক্ষার ভেতর দিয়ে পরিচ্ছন্নতার প্রতি একটি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে গ্রামের শ্রী পরিবর্ত্তিত হবে। এইজন্য সাফাইকে প্রথম মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।"

দ্বিতীয়তঃ, শিশুর শিল্পকাজ করবার কথা রয়েছে। কাতাই, বাগানের কাজ, কাগজ-কাটা, তালপাতার কাজ ইত্যাদি শিশু করবে। সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক উভয় প্রকার কাজ সে করবে।

গান্ধীজী আরও বলেছেন, "আমি যে পরিকল্পনা আপনাদের সমীপে উপস্থিত করেছি, তার দ্বারা আমরা আমাদের ছেলেমেয়েকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারে। এই সাত বছর তারা শুধু তকলি চালনাই শিখবে

না। আমার মতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ছেলেরা অল্প অল্প তূলা ধুনতে শিখবে। তারপর কার্পাসের ক্ষেত থেকে তূলা সংগ্রহ করা শিখবে। এসব শিক্ষার পর, তারা প্রথমে তকলি ও পরে চরকার সাহায্যে সূতা কাটা শিখবে। সূতা কাটা শিক্ষার পর তাদের তকলি, চরকা-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি শেখাতে হবে। সেজন্য তারা কাঠের ও ধাতুর কাজও শিখবে। এইভাবে যদি সমস্ত পাঠসূচী সাত বছরের জন্যে পরিকল্পনা করা যায়, তবে তা সাফল্যমণ্ডিত হবেই।"

কবি বলেছেন, 'কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম্ম ঝরুক পড়ে'—অর্থাৎ কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল অনুপ্রেরণা আসবে ভগবৎ নির্ভরতার উৎস থেকে। মহাত্মা গান্ধীর জীবন কর্ম্ম ও ভগবৎ নির্ভরতার এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। শিক্ষায় শিল্পের এই যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, এ শুধু আমাদের দেশের নিজস্ব ব্যাপার নয়। বিশ্বের সমস্ত অগ্রসর জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্পের স্থান আজ প্রধান এবং যে-কোন জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুধাবন করলে একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। চরকায় সূতা কেটে বস্ত্রে স্বাবলম্বী হওয়া ও বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে শাক-সব্জী উৎপাদন করার চেষ্টা করতে পারলে ভাল। শিশুদের মধ্যে এই কাজের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। গ্রামগুলিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার কাজে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য রয়েছে।

তৃতীয়তঃ, সাংস্কৃতিক দিক ও উৎসব অনুষ্ঠান—"বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎসব অনুষ্ঠানকে শিক্ষাদানের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। নানারকম অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে হয়ে থাকে ; যেমন রবীন্দ্র-জয়ন্তী, বুদ্ধ-পূর্ণিমা, বর্ষামঙ্গল, স্বাধীনতা দিবস পালন, শারদোৎসব, গান্ধী-জয়ন্তী ইত্যাদি। সময় সময় মনীষী স্মরণোৎসবও হয়। অভিনয়, চড়ুইভাতি, খেলার দিন পরিচালনা ইত্যাদিও প্রায় প্রতি বিদ্যালয়েই আছে। এর মাধ্যমে শিশুর প্রক্ষোভময় জীবন বিকশিত হয় ; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে হস্তলিখিত পত্রিকা থাকা দরকার। এর ভিতর দিয়ে কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যেমন, ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান, দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ, পরিবেশের সঙ্গে যোগ রেখে নানা খবর প্রকাশ করা, গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যোগ রাখা। বিদ্যালয় সংক্রান্ত অনেক সংবাদ শিশুর জানা এবং

সেইসঙ্গে অন্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া, বিদ্যালয়ের সাধারণ সমস্যা আনন্দ প্রকাশ করবার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পত্রিকার সঙ্গে বদল করে রুচিবোধ জাগ্রত করা। যেখানে দেওয়াল-পঞ্জী থাকে সেখানে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করার আগ্রহ শিশুর বাড়বে। এই সহপাঠ্য বিষয় বা ক্রিয়াকলাপ নিঃসন্দেহে শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়ক।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নিজস্ব স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। কারণ, "বিদ্যালয় হবে বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ।" বিদ্যালয়ে শিশুর স্বভাবের একটি প্যাটার্ণ (pattern) তৈয়ারী হয় এবং জীবনযাত্রার একটি প্রণালী সে বুঝতে পারে। পরবর্ত্তীকালে যে নাগরিক জ্ঞানের দরকার হবে, তার বাস্তবজ্ঞান শিশুরা বিদ্যালয়ে অর্জ্জন করে। বিদ্যালয়ে কতকগুলি সুবিধাও আছে—বাড়ীর চেয়ে বিদ্যালয়ে দল বেশী। ছেলেরা সমবয়সী এবং বিভিন্ন পরিবেশ থেকে তারা আসে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, "সমবয়সীরাই কেবল মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে শিশুদের কাজে স্বতঃস্ফুর্ত্তি আনতে পারে।......শিশুরা ভাল বিদ্যালয়ে সদাচরণ শিক্ষার যে সুযোগ পায়, পিতা-মাতা বহু চেষ্টা করেও তা দিতে পারেন না।"

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠ ও কাজের পরিকল্পনার ফলে শিক্ষকের প্রস্তুতি হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে ও পাঠদান বেশী প্রাঞ্জল হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ বা জীবনের কোনও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অথবা তা থেকে উদ্ভূত কৌতূহল নিবৃত্তির প্রেরণা শিশুদের পাঠ্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়। তাই, পাঠটির উপস্থাপন, কৌশল, কাজের অন্তর্নিহিত সমস্যা বা উদ্ঘাটন-কৌশল এবং কোনও অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ-কৌশলের ওপরই পাঠ্য বিষয়ের অবতারণা ও আগ্রহসৃষ্টি নির্ভর করে। এইজন্যে শিক্ষকের আগেই ভেবে রাখা অর্থাৎ পরিকল্পনা করা, ঐ কৌশলে পাঠদানের পক্ষে অর্থাৎ সম্বন্ধিত সঙ্গীকৃত পাঠদানের পক্ষে অপরিহার্য্য। সাফাই, শ্রেণীসজ্জা, সংবাদ লেখা ইত্যাদি প্রতিদিনের কাজ; উৎসব পালন, প্রজেক্ট ইত্যাদি বিশেষ সাময়িক কাজ এবং সূতা কাটা, বাগানের কাজ ইত্যাদি এই পরিকল্পনায় থাকবে।

সাপ্তাহিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষক দৈনন্দিন পাঠের পরিকল্পনা তৈরী করবেন। তার আগে তাঁকে term-এর পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় এই ধরণের এমন বহু কাজ আছে যে তার মাধ্যমে শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভবপর।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সামুদায়িক জীবন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "তোতা-কাহিনী"তে প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটির কথা ব্যঙ্গচ্ছলে আমাদের ব'লেছেন। মামুলি শিক্ষা যে জীবন-কেন্দ্রিক নয়, সে-কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার ক'রেছেন। আমরা চাই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা। তা না হলে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হবে না। শুধু বুদ্ধির বিকাশ হ'লে শিশু উত্তর-জীবনে অকূল পাথারে পড়বে। তাই সমাজের যোগ্য নাগরিক হ'তে হ'লে তার দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের প্রয়োজন। সামুদায়িক জীবনযাপন না ক'রলে অথবা শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাজ-জীবন গঠন ক'রতে না পারলে, জীবনযাপন করার শিক্ষা কোনও বিদ্যালয় দিতে পারবে না। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত হলে প্রত্যেক বালক-বালিকার সামগ্রিক সত্বার বিকাশলাভ ঘটবে এবং সে সমাজের সেবক হ'তে পারবে; এর জন্য বাধ্যবাধকতা বা আইনের সাহায্য নেবার দরকার হবে না, বরং এই শিক্ষাই তাকে সেইভাবে গড়ে তুলবে।

আমাদের জাতীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব'লে গ্রহণ করেছেন। আমাদের এখন কর্ত্তব্য হবে, যাতে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা অতি দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করে—তার জন্যে সচেষ্ট থাকা।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সামুদায়িক জীবনযাপন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলে আমরা বুঝতে পারব শিশুর সর্ব্বতোমুখী বিকাশের পক্ষে ইহা কতদুর কার্য্যকরী। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সামুদায়িক কাজ (Community work) নানারকম হতে পারে। যেমন—সাফাই, স্বাস্থ্যরক্ষা, জলখাবার বিতরণ, শিল্পকাজ, কৃষ্টিমূলক কাজ (অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত), হস্তলিখিত

পত্রিকা, আবহাওয়া-পঞ্জী, আন্তবিদ্যালয় ক্রীড়া, উৎসব, প্রদর্শনী, জনসংযোগ, চড়ুইভাতি, শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ, স্বায়ত্ব-শাসন-ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক জীবনযাপন, সমবায়-সমিতি, পরিবেশ পর্য্যবেক্ষণ, প্রার্থনা, ব্রতচারী, চলতি খবর লেখা, আলপনা, দিনলিপি, সখ (Hobby), প্রজেক্ট-পদ্ধতিতে কাজ ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের কর্ম্মসূচীর প্রারম্ভেই সমবেত প্রার্থনা হয়। তারপর একত্র সমাবেশে মহাপুরুষের বাণীপাঠ বা সৎ আলোচনা হয়, তাতে মন পবিত্র হয়।

সাফাই পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত একটি বিষয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই দেবত্ব নিহিত। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'কে অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে কল্পনা করা যায় না। গৃহ-প্রাঙ্গন ও গৃহাভ্যন্তর যেমন পরিষ্কার থাকবে, তেমনই অন্তরও বিমল রাখবার চেষ্টা করতে হবে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় চিরনির্ম্মল ও চিরমঙ্গলময়ের অবস্থান সম্ভব।

এই সত্যটি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে পরিচ্ছন্নতার সাধনা করা দরকার। জাতীয় ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতাবোধ শিশুদের মধ্যে জাগিয়ে দেবার জন্যে নঈ তালিম শিক্ষার মন্ত্র হিসাবে সাফাইকে গ্রহণ ক'রেছে। কাজের মধ্য দিয়ে এই জ্ঞানলাভ হয় ব'লে শিশুরা এতে লাভবান হয়। নঈ তালিমে সামুদায়িক জীবনযাপন ক'রতে বলা হ'য়েছে। শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ-গঠন এবং অস্পৃশ্যতা দূর করতে এর প্রয়োজন অত্যধিক। এতে কোন কাজ অমর্য্যাদাকর ব'লে বিবেচিত হয় না। এতে শিশুর নিময়ানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ সম্বন্ধেও বেশ জ্ঞান হয়। সৌন্দর্য্য-বোধ ও কর্ম্মপ্রিয়তার মধ্যে সমস্ত জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সাধনা এর ভিতর দিয়ে চলছে। প্রত্যেক মানুষের মনের জড়তা ও কর্ম্মবিমুখতাকে দূর ক'রতে সাফাই-এর দরকার রয়েছে। ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক সাফাই—উভয়ই প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সাফাইয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বসন-ভূষণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় এবং সামুদায়িক সাফাই-এর মধ্যে পড়বে শ্রেণী, আবাস-গৃহ, রাস্তাঘাট, জলাশয়, সার্ব্বজনীন স্থান ইত্যাদি।

কাতাই, বাগানের কাজ, তালপাতার আসন তৈরী প্রভৃতি যে সব কাজ রয়েছে, তার মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিক

সম্বন্ধে গ্রামোন্নয়নের জন্যে সহরের বুকে দাঁড়িয়ে শুধু লাউড্ স্পীকারে বক্তৃতা যেমন ভুল, তেমনি সংবাদপত্রের পাতায় কবিতা, প্রবন্ধাদি লিখে গ্রামবাসীকে সচেতন করার চেষ্টাও হয়ত বৃথা। খবরের কাগজ নিরক্ষর লোকের কাছে অবোধ্য। তাই গঠনমূলক কাজ আরম্ভ না ক'রে শুধু আইন ক'রে, বক্তৃতা দিয়ে ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে বেশী কিছু করা যাবে না। শিশুদের এই কাজে অভ্যাস জন্মাবার চেষ্টা ক'রতে হবে। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, সমাজ-কল্যাণ-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ ও আত্ম-নির্ভরশীলতার আদর্শে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা এবং দায়িত্বজ্ঞান তাদের হবে; নিজের জিনিসের প্রতি যত্ন, ভদ্র ব্যবহার তারা শিখবে এবং সেই সঙ্গে তাদের শ্রী ও ধী লাভ হবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নানারকম উৎসব অনুষ্ঠান হয়। যেমন, নবান্ন উৎসব, প্রজাতন্ত্র দিবস, গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিবস, বনভোজন, বসন্তোৎসব, বৃক্ষরোপণ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব প্রভৃতি। অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুতকালে দেখতে হবে—অনুষ্ঠানের দ্বারা যেন শিশুদের ও গ্রামবাসীর কৃষ্টিগত, নৈতিক ও সামাজিক মান উন্নত হ'তে পারে। উৎসব যেন শিশুদের কাছে আনন্দদায়ক হয়, ব্যয়বহুল না হয় এবং অনুষ্ঠানটির দ্বারা যেন এর উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এইসব অনুষ্ঠানের কোন কোন ক্ষেত্রে আল্পনা দেওয়া হয়। সুন্দর ও মনোরম আল্পনা দেওয়া একটি শিল্প। এ দেখে মন পবিত্র ও প্রসন্ন হয়। আলপনার সৌন্দর্য্যে ঘর রমণীয় হয় এবং তার স্নিগ্ধ শোভায় মানুষের মনে শান্তির প্রলেপ দেয়।

প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ব-শাসন-ব্যবস্থা থাকে। গণতন্ত্র একটি জীবনযাপন প্রণালী। এ পদ্ধতিতে সমাজের সভ্যরা একত্র বসবাস করে, ফলে সমাজে প্রত্যেকে যা দেয় এ সবচেয়ে বেশী দিতে পারে এবং সমাজের কাছ থেকেও এ খুব বেশী পায়।

গণতন্ত্র এমন একটি সংস্থা যেখানে সাধারণের হাতে খুব বেশী ক্ষমতা থাকে এবং প্রতিনিধি মারফৎ কাজ চালানো হয়। কিশোর বয়সের বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিদ্যালয় হবে সুনাগরিক হবার এবং জ্ঞানলাভের যোগ্য স্থান। তবে তাদের উপর

কাজের দায়িত্ব দেওয়ার আগে মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হবে। ছ' সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশু ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকে; সুতরাং দলের সঙ্গে তার সহযোগিতা কেমন তা প্রথমে লক্ষ্য ক'রতে হবে। তারপর শিশু তার পারিপার্শ্বিক ও আত্মীয়-স্বজনের অনুকরণ করে। তার make beleive-কে উৎসাহ দিতে হবে ও পরিচালনার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিচালনায় অংশ গ্রহণ ক'রলে নিয়মাবলী সানন্দে ও সুশৃঙ্খলভাবে পালিত হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে আত্মশৃঙ্খল। সঙ্কীর্ণচেতা ও ভীরু প্রকৃতির মানুষ দিয়ে গণতন্ত্র হয় না। প্রত্যেককে সাহসী, উদার, নির্ম্মল এবং প্রেমে মহৎ হ'তে হবে। এতে মানব মনে প্রেম জাগবে, তারা কর্ম্মতৎপর হবে, মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ ক'রবে এবং সর্ব্বোপরি তাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকবে। বিদ্যালয় বহুবিধ সামাজিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল হবে।

স্যার্ জন্ এ্যাজম্স্ যথার্থ ই ব'লেছেন, "বিদ্যালয় জ্ঞান বিতরণের স্থান নয় এবং শিক্ষক শুধু সংবাদ সরবরাহকারী নন।" যে সব বিদ্যালয় co-curricular activities দ্বারা গ্রামবাসীর সহযোগিতা লাভ করে, তাদের কাজ করা অনেক সহজ হয়। আমাদের দেশে মানুষের অজ্ঞতার জন্য কোন ভাল কাজও সহজে অগ্রসর হতে চায় না। স্বার্থপরতা, লোভ, vested interest, পুরানো ধারণা বা সংস্কার, নির্লিপ্ততা ইত্যাদি শিক্ষা দ্বারাই দূর হতে পারে। সমাজের সমস্যা সমাধান করার বোধ এইভাবে কিছুটা জন্মাতে পারে। অর্কেষ্ট্রাতে যেমন প্রতিটি বাদ্যযন্ত্র নিজে নিজের কাজ করে অথচ তাতে একটি সম্মিলিত সুর থাকে, তেমনি সামাজিক জীবনে প্রত্যেকে নিজে নিজের কাজ করে অথচ দলগত স্বার্থসিদ্ধ হয়।

সমাজ তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে সংস্থার চেয়ে বিদ্যালয়ের উপরেই সবচেয়ে বেশী আস্থা রাখে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্টতর হয়। যে সব কাজ শিশুরা বিদ্যালয়ে করে, তাতে তাদের কতকগুলি বৃত্তির বিকাশ হয়।

বিশিষ্ট জার্ম্মাণ শিক্ষাবিদ্ শ্লেয়ার্মাসের (Schliermacher) বলেছেন,

"সব প্রস্তুতিই কোনও বিশেষ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা এবং সব আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাই প্রস্তুতি-স্বরূপ।"

শিশুরা তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী কিছু কাজ ক'রতে পায়, তাদের দলগত কাজের অভ্যাস গড়ে ওঠে ও তারা দলের মত মেনে চলতে শেখে; এছাড়া তাদের গুণমাধুর্য্যও ফুটে ওঠে। যেমন, ভদ্র ও নম্র আচরণ, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, যথাসময়ে কাজ করা, চীৎকার না ক'রে কাজ করা, পালার জন্যে ধৈর্য্য, অসাধু কাজ যে গর্হিত তা বোঝা ইত্যাদি। দলের হয়ে কেমন কাজ করে, কোনও দোষ ক'রলে তা অস্বীকার করে কিনা, ত্রুটি সংশোধন করে কিনা, সহানুভূতি আছে কিনা, বিদ্যালয়ের প্রতি আনুগত্য অর্থাৎ শিশুর সামাজিকবোধ ও প্রক্ষোভময় জীবনের অনেক কিছুই এর ফলে জানতে পারা যায়। মানুষ যত অভিজ্ঞতা লাভ করে তার শেখার পরিধিও ততই বেড়ে যায়।

জন্ ডিউই বলেছেন, "সমাজের কোনও ক্ষুদ্র সংস্করণের মাধ্যমে যখন কোনও বিদ্যালয় প্রতিটি শিশুকে নাগরিক হিসাবে শিক্ষা দেয় এবং সেবা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বোধ তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে, তখন বৃহত্তর উত্তম একটি সমাজের কল্পনা করা যায় এবং সেই সমাজ উপযুক্ত, সুন্দর ও সুসমঞ্জস হবে।"

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সার্থক রূপদান সম্ভব হলে আশা করা যায় যে শিশুর সর্ব্বতোমুখী বিকাশ হবে। স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রত্যেকেরই উচিত এই শিক্ষার রূপায়ণে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা। কাজ চলতে থাকলে সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মতই সব সন্দেহের অবসান হবে। কবির কথার প্রতিধ্বনি করে আমরা বলতে পারি—

"ওরে, নূতন যুগের ভোরে
দিস্‌নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে।

* * * *

যেমন করে ঝর্ণা নামে দুর্গম পর্ব্বতে
নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়্
অজানিতের পথে॥"

প্রত্যেকের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সম্মিলিত হ'লে এর সার্থক রূপদান সম্ভব হবে। প্রত্যেকেই একাজে এগিয়ে আসবে। কবির কথায় বলা যায়—

"কে লইবে মোর কার্য্য কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, 'স্বামী'
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

আমরা প্রত্যেকেই হয়তো ক্ষীণশিখা মাটির প্রদীপ ; এই দীপশিখাই দীপান্তরে সঞ্চারিত হ'য়ে একদিন সারাদেশে দীপালীর উৎসব জাগাবে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালী

অনুবন্ধ প্রণালী বলতে শিল্প, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষাকে বোঝায়। একে সমবায় বা সম্বন্ধিত পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। শিক্ষাজগতে ইহা নতুন নয় ; এবং এই ধারণাই নতুন পদ্ধতি ও সাধারণ শিক্ষকের ধারণার মধ্যে এক প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। সম্বন্ধিত পদ্ধতি বলতে প্রচলিত শিক্ষায় কোনও বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার সময় উহার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বুঝায়।

উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি বিষয়ের অবতারণা করতে পারি। গরু সম্বন্ধে পড়াতে গিয়ে শিক্ষক গরুর ছবি অথবা হয়ত গরু দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু, বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুকে গো-সেবা করতে হয়। ফলে, গরু সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য সে আহরণ করতে পারে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার সম্বন্ধিত পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন এবং পুরাতন পদ্ধতির সঙ্গে এর আদৌ মিল নেই। কেউ আবার হাতে একটি তকলি নিয়ে শিশুকে তূলা, খাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং তাকে বুনিয়াদী সম্বন্ধিত পদ্ধতি বলেন। এই সব ধারণা ভ্রান্ত। পুরাতনের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধিত পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে। এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠবে—এই নতুন সম্বন্ধিত পদ্ধতি কি? এর উত্তর, "It is correlation with craft materials, craft processes, craft

"সব প্রস্তুতিই কোনও বিশেষ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা এবং সব আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাই প্রস্তুতি-স্বরূপ।"

শিশুরা তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী কিছু কাজ ক'রতে পায়, তাদের দলগত কাজের অভ্যাস গড়ে ওঠে ও তারা দলের মত মেনে চলতে শেখে; এছাড়া তাদের গুণমাধুর্য্যও ফুটে ওঠে। যেমন, ভদ্র ও নম্র আচরণ, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, যথাসময়ে কাজ করা, চীৎকার না ক'রে কাজ করা, পালার জন্যে ধৈর্য্য, অসাধু কাজ যে গর্হিত তা বোঝা ইত্যাদি। দলের হয়ে কেমন কাজ করে, কোনও দোষ ক'রলে তা অস্বীকার করে কিনা, ত্রুটি সংশোধন করে কিনা, সহানুভূতি আছে কিনা, বিদ্যালয়ের প্রতি আনুগত্য অর্থাৎ শিশুর সামাজিকবোধ ও প্রক্ষোভময় জীবনের অনেক কিছুই এর ফলে জানতে পারা যায়। মানুষ যত অভিজ্ঞতা লাভ করে তার শেখার পরিধিও ততই বেড়ে যায়।

জন্ ডিউই বলেছেন, "সমাজের কোনও ক্ষুদ্র সংস্করণের মাধ্যমে যখন কোনও বিদ্যালয় প্রতিটি শিশুকে নাগরিক হিসাবে শিক্ষা দেয় এবং সেবা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বোধ তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে, তখন বৃহত্তর উত্তম একটি সমাজের কল্পনা করা যায় এবং সেই সমাজ উপযুক্ত, সুন্দর ও সুসমঞ্জস হবে।"

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সার্থক রূপদান সম্ভব হলে আশা করা যায় যে শিশুর সর্ব্বতোমুখী বিকাশ হবে। স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রত্যেকেরই উচিত এই শিক্ষার রূপায়ণে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা। কাজ চলতে থাকলে সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মতই সব সন্দেহের অবসান হবে। কবির কথার প্রতিধ্বনি করে আমরা বলতে পারি—

"ওরে, নূতন যুগের ভোরে
দিস্‌নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে।

* * * *

যেমন করে ঝর্ণা নামে দুর্গম পর্ব্বতে
নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়্
অজানিতের পথে॥"

প্রত্যেকের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সম্মিলিত হ'লে এর সার্থক রূপদান সম্ভব হবে। প্রত্যেকেই একাজে এগিয়ে আসবে। কবির কথায় বলা যায়—

"কে লইবে মোর কার্য্য কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, 'স্বামী'
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

আমরা প্রত্যেকেই হয়তো ক্ষীণশিখা মাটির প্রদীপ; এই দীপশিখাই দীপান্তরে সঞ্চারিত হ'য়ে একদিন সারাদেশে দীপালীর উৎসব জাগাবে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালী

অনুবন্ধ প্রণালী বলতে শিল্প, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষাকে বোঝায়। একে সমবায় বা সম্বন্ধিত পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। শিক্ষাজগতে ইহা নতুন নয়; এবং এই ধারণাই নতুন পদ্ধতি ও সাধারণ শিক্ষকের ধারণার মধ্যে এক প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। সম্বন্ধিত পদ্ধতি বলতে প্রচলিত শিক্ষায় কোনও বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার সময় উহার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বুঝায়।

উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি বিষয়ের অবতারণা করতে পারি। গরু সম্বন্ধে পড়াতে গিয়ে শিক্ষক গরুর ছবি অথবা হয়ত গরু দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু, বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুকে গো-সেবা করতে হয়। ফলে, গরু সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য সে আহরণ করতে পারে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার সম্বন্ধিত পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন এবং পুরাতন পদ্ধতির সঙ্গে এর আদৌ মিল নেই। কেউ আবার হাতে একটি তকলি নিয়ে শিশুকে তুলা, খাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং তাকে বুনিয়াদী সম্বন্ধিত পদ্ধতি বলেন। এই সব ধারণা ভ্রান্ত। পুরাতনের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধিত পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে। এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠবে—এই নতুন সম্বন্ধিত পদ্ধতি কি? এর উত্তর, "It is correlation with craft materials, craft processes, craft

work, natural environment and social environment of the child". একথা সত্য, কিন্তু আরও পরিষ্কার ক'রে বলা প্রয়োজন।

শিক্ষকতা একটি কলাবিশেষ। কিন্তু, শিক্ষা সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে একে বিজ্ঞানও বলা চলে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে নিখুঁত ও বিজ্ঞানসম্মত না হলে কোন শিক্ষাপদ্ধতি যথেষ্ট নয়। ইহার পিছনে একটি উদ্দেশ্য থাকা অত্যাবশ্যক। সাধারণ সমন্বিত পদ্ধতির সঙ্গে নঈ তালিমের সমন্বিত পদ্ধতির প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে সহজে তা ধরা যায় না। "The difference is more of degree than of form. In Basic Education this relation is very close and intimate." অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য্য প্রয়োজনের বন্ধনে ইহা বাঁধা রয়েছে। একজন শিশু একটি গরু দেখল। কিন্তু, তাই বলে তাকে যে গরু সম্বন্ধে বলতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। প্রচলিত শিক্ষায় ইহা ঠিক হলেও, বুনিয়াদীতে ইহা ভ্রান্ত। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিশু গো-সেবা করবে। প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে গরুর সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যাবে এবং ইহার গতিবিধি লক্ষ্য করবে; তখন আর তাকে কোনও কথা বলে দিতে হবে না, সে নিজেই ইহার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে। তার মনে যে প্রশ্ন উঠবে, শিক্ষক তার উত্তর দেবেন অথবা ইহার মাধ্যমে শিক্ষা দেবেন। শিশুর চিন্তা, বুদ্ধি অথবা আগ্রহ যাতে জন্মে, তা-ই স্বাভাবিক। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, শিশুর ওপর কোনও কিছু জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হবে না; স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে শিশুকে শেখবার সুযোগ দিতে হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে দু' রকমের সমন্বিত পদ্ধতি রয়েছে—(১) প্রচলিত শিক্ষার সমন্বিত পদ্ধতি এবং (২) নঈ তালিমের সমন্বিত পদ্ধতি।

সাধারণ বা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে নঈ তালিমের সমন্বিত পদ্ধতির সুস্পষ্ট প্রভেদ রয়েছে। সাধারণ সমন্বিত পদ্ধতির অন্য একটি বিষয়কে পরিষ্কার ক'রে বুঝাবার জন্যে কোনও বিষয়ের অবতারণা করা হয় এবং শিক্ষা দেবার প্রধান বিষয় হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একজন শিশু সূতা কাটছে। তার সূতা অনবরত ছিঁড়ে যাচ্ছে। এর কারণ হল—উষ্ণ জলবায়ু। এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষক কেবল সূতা কাটাকেই

অত্যাবশ্যক বিষয় বলে মনে করবেন না, জলবায়ু সম্বন্ধেও তিনি বলবেন এবং উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা বলবেন। অপর প্রভেদ সজীব এবং এর মধ্যেই বুনিয়াদী সম্বন্ধিত পদ্ধতির আসল অর্থ নিহিত রয়েছে। বুনিয়াদী সম্বন্ধিত পদ্ধতির অর্থ হল—"Action and work." সহজভাবে একে বলা হয়—"Learning by doing." একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। মাটির প্রকারভেদ সম্বন্ধে জানাবার জন্যে যদি শ্রেণীতে বিভিন্ন মাটি কিছু পরিমাণে এনে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া সাধারণ সম্বন্ধিত পদ্ধতি । কিন্তু, শিশু মাঠে কাজ করতে গিয়ে যা শেখে, তা হয় বুনিয়াদী। শিক্ষক এক্ষেত্রে শিশুকে পথ দেখাবেন। সুতরাং, "Correlation in Basic Education means much deeper relation than that implied by association. It means the relation which exists between the work and the education received through doing that work."

তূলা তুনাই করার সময় শিশুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কোথায় তূলা উৎপন্ন হয়? কি মাটি এবং কি অনুকূল পরিবেশে তূলা বেশী জন্মে ইত্যাদি। তুলা উৎপন্নেরস্থান মানচিত্রে দেখিয়ে দেওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে ভারত অথবা সম্বন্ধিত দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। এভাবে শিশুকে ভূগোল শেখানো যায়। এছাড়া, তূলা সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাকে বলা যায়। গান্ধীজীর জন্মদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিশুকে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বলা যায়। এই উপায়ে কাতাই, সামাজিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে শিশুকে বহু বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়। মনে রাখতে হবে যে, জোর ক'রে শিশুর ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। শিশু যা জানতে চাইলে, তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। এইভাবে সম্বন্ধিত ক'রে শিশুকে নানা বিষয়ে জ্ঞানদান করা সম্ভব।

কোনও এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক গতিকে সম্বন্ধিত পদ্ধতি বলা হয়। ইহা শুধু প্রয়োজনবোধেই আসবে। সূতা কাটার পর শিশুকে তা অটেরণে গুটাতে হয়, এই সময় তাকে গুণতে হয়। এটা খুবই স্বাভাবিক। কাজের সম্পূর্ণতার জন্যে আপনা-আপনিই

যেখানে চিন্তার অথবা লেখাপড়ার প্রয়োজন হয় সেখানে ততটুকুই করা বাঞ্ছনীয়।

বিষয়ান্তরে যাওয়ার সহজ ও স্বাভাবিক গতিকে আমরা 'সমবায় প্রণালী' আখ্যা দিতে পারি। শিশুকে ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পৃথক শেখানোর কোন প্রয়োজন নাই। বোধ হয়, এই কারণেই শিক্ষাবিদ্‌রা অবিভাজ্য পাঠ্যক্রমের কথা বলেছেন। সমবায়-প্রণালী, সম্বন্ধিত পদ্ধতি এবং অনুবন্ধ প্রণালী একই পদ্ধতির বিভিন্ন নাম। সমবায় প্রণালীতে শিক্ষাদান সম্ভবতঃ এই মনস্তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। "নানান দেশের ছেলে-মেয়ে" রচনাটি পড়বার সময় অভিনয় করতে পারলে অবশ্যই মনোমুগ্ধকর ও গ্রহণযোগ্য হবে। এইভাবে আপনা-আপনি কাজ এসে পড়বে। মনে রাখতে হবে, সমবায় প্রণালী শুধু প্রয়োজনবোধেই আসবে।

কাজের প্রয়োজনে বৌদ্ধিক শিক্ষাকেই সম্বন্ধিত জ্ঞান বলে। শুধু কাজ সম্পাদনার জন্যেই যখন বৌদ্ধিক জ্ঞানকে সীমিত রাখা হয়, তখনই সেই সম্বন্ধিত জ্ঞানকে বলে Integrated knowledge বা সাঙ্গীকৃত জ্ঞান। বিনোবাজী Integrated knowledge-কে "সমবায়" বলেছেন।

Integrated knowledge-এ জ্ঞানের আগ্রহ জন্মানো যত স্বাভাবিক, correlated knowledge-এ তত নয়। যখন প্রসঙ্গ স্বভাবতঃ আসে ও শিশুর আয়ত্তসাধ্য হয়, তখন correlated knowledge কোনও ভাবেই integrated knowledge অপেক্ষা কম যোগ্যতাসম্পন্ন নয়।

Correlated knowledge তিন প্রকার। যথা, (১) Co-lateral correlation—ইহা Integrated knowledge-এর সমপর্য্যায় অর্থাৎ ইহা কাজের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত; (২) Unilateral correlation—এর সঙ্গে কাজের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক না হলেও জ্ঞানের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক নিকট ও (৩) Multilateral correlation—এখানে কাজের সঙ্গে যে সম্বন্ধিত জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে অপর একটি নতুন জ্ঞানে পৌঁছান—এইভাবে ক্রমশঃ অগ্রগতি বুঝায়।

কাজকে বৌদ্ধিক শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করতে গেলে কাজের পরিকল্পনা রচনায় ও সম্পাদনে বেশ সচেতনতার দরকার। তা না হলে

শুধু যান্ত্রিকভাবে কর্ম্ম সম্পাদন হবে, বৌদ্ধিক জ্ঞানের পরিবেশনের অবকাশ ঘটবে না। তাই, কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় কাজের ও সম্বন্ধিত পাঠের পূর্ব্ব পরিকল্পনা খুব দরকার। নিছক কাজের যে বৌদ্ধিক বিষয় আসে তা কর্ম্মসম্পাদনের অন্তর্নিহিত তাগিদে শেখবার এই ব্যবস্থাকে সাঙ্গীকৃত বৌদ্ধিক শিক্ষা বলা হয়। বিনোবাজী একে সমবায় বলেছেন। এখানে জ্ঞান কর্ম্মের সহায়ক—যা জানা গেল তা কাজে প্রযুক্ত হবার সুযোগ থাকে। তাই এক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথক করা যায় না—দুই-ই একে অপরকে সম্পৃক্ত করে। এ আদর্শ হিসাবে ভাল কিন্তু রূপ দেওয়া কঠিন।

অনুবন্ধ প্রণালী :

(১) একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনুবন্ধ ; (২) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ ; (৩) পাঠ্যগ্রন্থ ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুবন্ধ অর্থাৎ বিদ্যালয় ও বহির্জগতের মধ্যে অনুবন্ধ।

অনুবন্ধ একান্ত প্রাসঙ্গিক, সহজ ও স্বাভাবিক হবে। স্বাভাবিক সংযোগ ব্যবস্থাকে কষ্টকল্পিত ও কৃত্রিম করে তুললে, সেই অবস্থার অনুবন্ধকে "কেন্দ্রবন্ধ প্রণালী" (Concentration) বলা হয়। T. Raymont 'রবিনসন ক্রুসো'কে কেন্দ্রীয় বিষয় হবার কথা বলেছেন। কারও মতে ইতিহাস, কারও মতে প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং অন্য কারও মতে কারুশিল্প কেন্দ্রীয় বিষয় হবে। কেন্দ্রীয় বিষয়কে বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে তাকে সংযোজন (Integration) প্রণালীও বলা হয়।

সহবন্ধ প্রণালী (Co ordinatjon) :

একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সব বিষয় না এনে কয়েকটি গুচ্ছ (group) করা যেতে পারে। ডঃ হ্যারিস বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়গুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা,—(১) সাহিত্য ও ললিতকলা, (২) জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা, (৩) ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা, (৪) ভূগোল ও বিজ্ঞান ও (৫) ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান।

যাই হোক, অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভ স্থায়ী হয়। পরপৃষ্ঠায় অনুবন্ধ প্রণালীর উদাহরণ দেওয়া হ'ল—

(i)

কাতাই

ভাষা	গণিত	ইতিহাস	ভূগোল	স্বাস্থ্য	সাধারণ বিজ্ঞান	তূলা পরিকল্পনা
তূলার বিবরণ	গণনা	শীতাতপের আধিক্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ কি উপায় অবলম্বন করেছে, সভ্যতা-বিবর্ত্তনে সূতার পরিচ্ছদ কোন্ অংশ গ্রহণ করেছে, ভারতের তূলা-শিল্পের ক্রমবিকাশ, পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের সমৃদ্ধিজনক তূলার বাণিজ্য, বৃটিশ শাসনাধীনে তূলা-ব্যবসায়ের অবনতি এবং স্বাধীনতা লাভের পর ইহার পুনরভ্যুদয়।	পৃথিবীর নানাদেশে তূলা-চাষের অনুপাত, তূলা চাষের উপযোগী জলবায়ু, তূলার আমদানী-রপ্তানী, সূতা হইতে কাপড় তৈরীর উপায়সমূহ, শিল্পবিপ্লব।	ধুনাই	উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ণ, কৃষি-বিদ্যা, জলবায়ুতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান।	তূলা-চাষ, ফসলের ক্রম-পরিণতির স্তর-সমূহের সতর্ক পর্য্যবেক্ষণ, সূতা-কাটা, বয়ণ, বস্ত্রতৈরী ইত্যাদি।

(ii)

গ্রাম পর্য্যবেক্ষণ

ভাষা	গণিত	ভূগোল	সমাজশিক্ষা	স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান
গ্রামের ইতিহাস, আয়তন, লোকসংখ্যা, ধর্ম্ম ও জাতি, পেশা, নদী, ধর্ম্মস্থান ইত্যাদি।	গ্রামের জমির পরিমাণ, মাথাপিছু গড়পড়তা জমির পরিমাণ, প্রতি একরে শস্য উৎপাদন।	শস্য, ফল, শাক-সব্জী, রাস্তা ইত্যাদি।	বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের শিশুর সংখ্যা। শিক্ষা-গ্রহণ না করার কারণ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ।	স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় তথ্য, রোগ—ইহার কারণ ও প্রতিকার, পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা।

(iii)
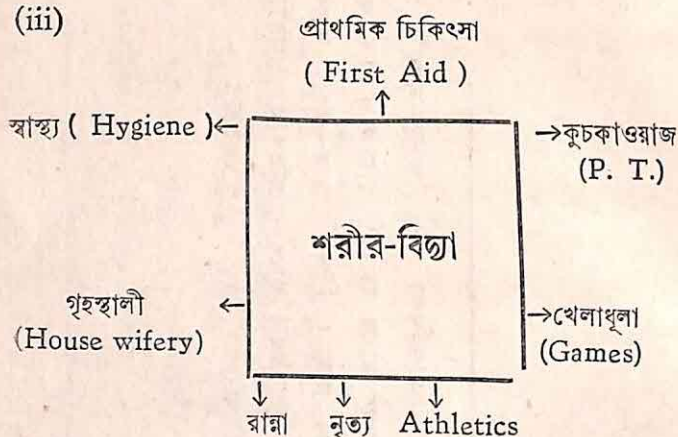
(iv) "উৎসবাদি উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েরা আনন্দের সঙ্গে অনেক হাতের কাজ করে। এই উপলক্ষ্যে তারা অনেক কিছু শিখতে পারে। যেমন,— 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করতে তারা এই সব জিনিষ নিজেদের হাতে তৈরী করতে পারবে—

(১) পতাকা-দণ্ড তৈরি করতে পারবে ;

(২) সূতা কাটতে পারবে ;

(৩) ঐ সূতা রং করতে পারবে ;

(৪) ঐ রঙ্গীন সূতা দিয়ে জাতীয় পতাকা বুনে নিতে পারবে ;

(৫) কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত শিখতে পারবে ;

(৬) (উচ্চতর শ্রেণীতে) নানা দেশের জাতীয় পতাকার ছবি আঁকতে পারবে ;

(৭) জাতীয় পতাকায় বিভিন্ন বর্ণের তাৎপর্য্য শিখতে পারবে ;

(৮) নিয়মতান্ত্রিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, অভিবাদন, অবনমন ও সংরক্ষণ করতে শিখবে ;

(৯) কুচকাওয়াজ শিখতে পারবে ; এবং এই উপলক্ষ্যে—

(ক) দেশাত্মবোধক কবিতা মুখস্থ করতে পারবে ;

(খ) গান শেখা উপলক্ষ্যে গানটি শিখে নিতেও পারবে ;

(গ) মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও জওহরলালের বাল্যজীবন শুনতে এবং পড়তে চাইতে পারে ;

(ঘ) অন্যান্য দেশের জাতীয় পতাকা আঁকতে গিয়ে ঐ সকল দেশের সম্বন্ধে কিছু ভৌগোলিক জ্ঞান ও আয়ত্ত করতে পারে ;

(ঙ) স্বাধীনতা-প্রাপ্তি প্রসঙ্গে পরাধীন ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্যাদিও শিখতে পারবে ;

(চ) প্রসঙ্গক্রমে অনুরূপ আরও কিছু (যেমন, খবরের কাগজ থেকে ছোটদের উপযোগী প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি) পড়তে পারবে ;

বিভিন্ন শ্রেণী এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কাজ করবে।"

—(শিক্ষণ ব্যবহারিকা)।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক

যিনি শিক্ষা দেন, তাঁকে শিক্ষক বলা যেতে পারে। শিশু জন্মগ্রহণ করার পর থেকে জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার বাবা, মা ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে থাকে। শিশু ক্রমশঃ বড় হয় এবং যথাসময়ে সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ও শিক্ষা সমাপ্ত করে, যাঁরা পুঁথির পাতার সঙ্গে শিশুর সংযোগ করে দেন, সাধারণতঃ তাঁরাই জনসমাজে শিক্ষক নামে পরিচিত। কিন্তু শিশুর জীবনের সঙ্গে তাঁরা প্রকৃত-পক্ষে কতটুকু সংশ্লিষ্ট, তাঁদের প্রভাব শিশুর ওপর কতটুকু বিস্তারলাভ করে এবং তার শরীর-মন পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও শুদ্ধ করে দেবার জন্যে কতখানি দায়ী, তা সত্যিই চিন্তার বিষয়।

সার্ জন্ অ্যাডাম্‌স্ শিক্ষককে 'মানব-সংগঠক' বলেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, শিশুর মনে প্রভাব বিস্তার করতে শিক্ষকের চেয়ে বেশী আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যে বিষয়ই শিক্ষক পড়ান না কেন, তার প্রভাব অল্প-বিস্তর শিশুর ওপর অনিবার্য্যভাবেই পড়ে। বৃহত্তর অর্থে যীশুখৃষ্ট, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, প্লেটো, সক্রেটিস্ প্রভৃতিকেও শিক্ষক বলতে পারা যায়।

বেদ ও উপনিষদের যুগে ভারতে শিক্ষকের খুব মর্য্যাদা ছিল। তাঁরা গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈদিক আচার্য্যের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও গভীর জ্ঞান উল্লেখযোগ্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন, "দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে—তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ; নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে। কেননা, মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিষটি আশ্রমের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান।" প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিত্ব চরিত্র ও বিদ্যার সাধনা দ্বারা শিক্ষক ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করবেন। তাঁরা শিক্ষাব্রতী, গুরু—তাঁরা ছাত্রদের শুভাকাঙ্খী, সুহৃদ্ ও জীবন্ত আদর্শ। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও প্রীতি আকর্ষণ করে তাঁরা তাঁদের উচ্চাসনে বসবার অধিকার লাভ করবেন।"

ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক কেবল শিক্ষাদানের হ'লে চলবে না, যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধ হওয়া চাই। গুরুর বৈশিষ্ট্য, তিনি স্বয়ং বিদ্যার চর্চ্চা ও শিক্ষাদান কার্য্যে আপনার হৃদয়ের প্রীতি ও জ্ঞানের দ্বারা ছাত্রদের আকর্ষণ করবেন এবং আপনার অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মনে শক্তির সঞ্চার করবেন। গুরু বিদ্যাদান করবেন এবং শিষ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্যা-গ্রহণের জন্যে তৈরী করবেন, ইহা তাঁরই দায়িত্ব। "It is extra-ordinary that our school teachers all of whatever subject they teach before the age of twenty-four or twenty-five and then all their further education is left to "experience" which in most cases is another name for stagnation. We must realize that experience needs to be supplemented before reaching its fullness and that a teacher to keep alive and fresh, should become learned from time to time. Constant outpouring

needs constant intaking; practice must be reinforced by theory and the old must be constantly tested by the new." (*Report of the University Education Commission appointed by the Govt. of India*)

পার্‌সিভ্যাল রেন্‌ বলেছেন, "শিক্ষক কেবল খবরের উৎস বা ভাণ্ডার নন; শিক্ষক শিশুর বন্ধু, পরিচালক ও উপদেষ্টা; তিনি সুদক্ষ শরীর গঠনকারী, মনের বিকাশ সাধনকারী ও চরিত্র গঠনকারী। সুতরাং, শিক্ষকের কাজ যে কত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ, তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষকতা একটি 'আর্ট'—ইহা যেমন বিরাট, আয়ত্ত করাও তেমনই সুকঠিন। র‍্যাণ্ডেল জে. কন্‌ডন্‌ বলেছেন, "জ্ঞান ও নৈপুণ্যের জন্যে শিক্ষা দাও। কিন্তু আত্মার চর্চ্চার কথা বিস্মৃত হয়ো না, কারণ এ থেকেই প্রাণে প্রাচুর্য্য আসে। এই হ'ল শিক্ষার প্রকৃত মূলকথা। কারণ, জ্ঞানের চেয়ে চরিত্র মহত্তর এবং আত্মার বিনাশ নেই।"

মন গ্রহণযোগ্য একটি আধার মাত্র নয়। বুদ্ধি ও জ্ঞান তাতে ঢেলে দিলেই কর্ত্তব্য শেষ হবে। তা যদি হত, তাহলে, বিংশ শতাব্দীতে বেতার ও গ্রামোফোনের যুগে বিদ্যালয়ের কোনও প্রয়োজন থাকতো না। কিন্তু ইহা মন দেওয়া-নেওয়ার কাজ বা আত্মিক সম্বন্ধের ব্যাপার। কার্লাইল বলেছেন, "মনের সঙ্গে নিগূঢ় সংযোগের দ্বারাই মন উন্নত হয়, চিন্তা থেকে চিন্তা উদ্রিক্ত হয়।" উপনিষদে আছে, "প্রাণঃ প্রাণং দদাতি", অর্থাৎ প্রাণ থেকে প্রাণের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "আমরা জেনেছিলাম মানুষ মানুষের কাছ থেকেই শিখতে পারে, যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলে ওঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হ'য়ে শোণিত-স্রোতের মত চলাচল করতে পারে।" শিক্ষাদান কাজে শিক্ষকের এই আত্মীয়তার সম্বন্ধ ও আন্তরিক আগ্রহের অভাব হলে, তা প্রাণহীন যন্ত্রের কাজের মত হয় এবং প্রাণহীন শিক্ষা কখনও চিত্তাকর্ষক ও কার্য্যকরী হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন, "আদর্শ শিক্ষক মুহূর্ত্তে ছাত্রের সঙ্গে অভিন্ন আত্মা হতে পারেন, ছাত্রেরই মন দিয়ে তার সমস্যা

বুঝতে পারেন।” সুতরাং, শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের শুধু শিক্ষা-দানের সম্বন্ধ নয়, যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধও হওয়া চাই।

সমাজের সঙ্গেও শিক্ষকের আত্মিক যোগ রয়েছে। তাঁদের জীবনাদর্শ সমাজে প্রতিফলিত হয়। তাই, সমাজের শুভাশুভ পরোক্ষভাবে তাঁদের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা জাতির ভবিষ্যৎ, জীবনের পথ-প্রদর্শক। সমাজের প্রতি শিক্ষকের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, শিক্ষকের প্রতি সমাজেরও তেমনই কর্ত্তব্য। আর্থিক দুরবস্থার জন্যে শিক্ষককে যদি উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়, তাহলে শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা করবার উদ্ভাবনী-শক্তি ও উৎসাহ আসা কি সম্ভব? নিরুৎসাহের অন্ধকারে শিক্ষকের জীবন সমাচ্ছন্ন হলে এবং অসন্তুষ্টি তাঁর মনকে বিষাক্ত করে তুললে, জ্ঞানামৃত বিতরণ করবার সময় তাঁর কাছ থেকে কতটুকু সততা আশা করা যায়? এক্ষেত্রে, দায়িত্ব সারার মতই তিনি হয়ত কাজ করবেন। ছাত্ররা তাঁর কাজে প্রেরণা নাও পেতে পারে; বরং, ফাটা গ্রামোফোনের মত ঘ্যানঘ্যান শব্দ শুনে তারা বিরক্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং, শিক্ষকতা কাজে শৈথিল্যের জন্যে শিক্ষকের আর্থিক অস্বচ্ছলতা অন্যতম প্রধান একটি কারণ হ'তে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রের এ বিষয়ে সাধ্যমত যথাকর্ত্তব্য করা উচিত।

প্রাচীনকালে এ দেশে গুরুরা অর্থের কথা চিন্তা করে বিদ্যাদান করতেন না। অবশ্য, এখন অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। অভাবের তাড়নায় আদর্শের কথা আজকাল মানব-হৃদয় কদাচিৎ স্পর্শ করে। দারিদ্র্যের তাড়নায় অধিকাংশ শিক্ষকেরই শিক্ষার আলো প্রায় নির্ব্বাপিত। এই অসন্তুষ্ট ও ভগ্নোৎসাহ শিক্ষকের কাছ থেকে কতটুকু আশা করা যায়? তবুও সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা চিন্তা করে আনন্দ বা সেবাকে শিক্ষকের সবচেয়ে বড় পুরস্কার মনে করা উচিত। ত্যাগের দুঃখ যেমন বড়, তার শান্তি এবং মাধুর্য্যও তেমনই বড়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, “শিক্ষাদাতাদের শিশুর মাতা-পিতার চেয়েও সম্মান দেওয়া উচিত; কারণ, মাতা-পিতা শিশুর জন্মদাতা মাত্র, কিন্তু শিক্ষাদাতারা তাকে উন্নত জীবন-যাপনের শিক্ষা দেন।”

আদর্শস্থানীয় শিক্ষক বর্ত্তমানে দুর্লভ—একথা বলা অসঙ্গত নয়। কথায়

আছে, "কবির ন্যায় শিক্ষকও জন্মগ্রহণ করেন, শিক্ষককে তৈরী করা যায় না।" বর্ত্তমানকালে অনেকে এ কথাকে আংশিক সত্য বলে মনে করেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ক'রে শিক্ষক কাজে অগ্রসর হলে, তাঁর শিক্ষাদান উন্নত হ'তে পারে। শিক্ষাদান ক'রতে হলে শিক্ষকের নিজের জীবনকে আগে আদর্শস্থানীয় ক'রে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। কিছুদিন আগেও কোন কোন শিক্ষক যে পীড়ক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তা বলেছেন; শিক্ষক সম্বন্ধে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "শিক্ষককে দেখলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত। প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়—যাদের হুল আছে, তাদের দাঁত নেই। আমাদের পণ্ডিত মশাইদের দুই-ই ছিল। এদিকে কিল, চড়-চাপড় চারা-গাছের বাগানের ওপর শিলাবৃষ্টির মত অজস্র বর্ষিত হত, ওদিকে তীব্র বাক্য-জ্বালায় প্রাণ বা'র হয়ে যেত। কেবল একটি দেবতার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যেত, তাঁর নাম যম।" তবে পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক। আধুনিক ভারতীয় শিক্ষকের সঙ্গে প্রাচীন ধারার অর্থাৎ বেদ্ ও উপনিষদের যুগের গুরুর কোনও যোগ প্রায় নেই বললেই চলে। কিছুদিন আগেও প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষক ছিলেন মুখ্য, বিষয় গৌণ ও ছাত্র নগণ্য ছিল। কিন্তু, বর্ত্তমানে শিশু পুরোভাগে এসেছে এবং শিক্ষক থাকেন নেপথ্যে। শিক্ষাদান পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্ত্তন কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছে। শিক্ষাদান করতে হ'লে এ সম্বন্ধে জেনে কাজে অগ্রসর হ'লে সুফল পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষক মানুষ, তাঁর দোষ-গুণ দুই-ই থাকবে। দোষ সংশোধন ক'রে গুণের অধিকারী হওয়া শিক্ষকের উচিত।

শিক্ষকের শরীর সুস্থ সবল হবে এবং তিনি কষ্টসহিষ্ণু হবেন। লক্, বলেছেন, সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের কথা। শরীর সুস্থ থাকলে শিক্ষকের কাজে আগ্রহ ও উৎসাহ আসবে। তাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এবং উচ্চারণ স্পষ্ট ও শুদ্ধ হলে ভাল।

তাঁর ব্যবহার অমায়িক হবে এবং তিনি সরল, নিষ্ঠাবান ও প্রফুল্লচিত্ত হবেন। তাঁর দরদ-ভরা হৃদয়, একনিষ্ঠ সাধনা ও ত্যাগ এবং অসীম ধৈর্য্য থাকা চাই। তিনি সত্যবাদী, অকপটচিত্ত, ন্যায়পরায়ণ, পক্ষপাতশূন্য ও

কর্ম্মপ্রিয় হবেন। দুশ্চিন্তা, ভাবপ্রবণতা ও উদ্বিগ্নতা থেকে তিনি মুক্ত হবেন। তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চিত্ত হলে চঞ্চলমতি শিশুদের কর্ত্তৃত্বে রাখতে পারবেন। অথচ তিনি ছাত্রদের অকৃত্রিম বন্ধু হবেন। তাঁর মত উদার হবে, নতুন সত্যকে গ্রহণ করবার মত মন থাকবে এবং শুভ মতবাদের প্রতি সহনশীলতা থাকবে। তিনি নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাংস্কৃতিক উন্নতি, সহযোগিতার প্রবৃত্তি, আলস্যশূন্যতা, শালীনতা বা শোভন মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহার, গ্রামের প্রতি সহানুভূতি, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ইত্যাদি গুণগুলির প্রতীক হবেন। শিক্ষকের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনায় জনৈক শিক্ষাবিদ বলেছেন,—

> "A heart that never hardens,
> A temper that never tires,
> A touch that never hurts."

এই গুণ তাঁর মধ্যে দেখলে অপরে অনেকাংশে অনুপ্রাণিত হবে। শিক্ষক মাত্রেরই কিছু রসজ্ঞান থাকা দরকার। প্রয়োজনবোধে তিনি ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে অবশ্যই সংযোগ রাখবেন।

বিষয়বস্তু ও তার শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকবে। গভীর জ্ঞানের ওপর আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষকতা কাজে এই আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। বিচক্ষণ চিকিৎসক যেমন আগে রোগ নির্ণয় করেন ও পরে ঠিকমত ঔষধ প্রয়োগ করেন, শিক্ষকও তেমনি মনস্তত্ত্ব জেনে কাজে অগ্রসর হবেন। হোরেস্ মান্ বলেছেন, "যে শিক্ষক ছাত্রকে শেখবার আগ্রহে অনুপ্রাণিত না ক'রে শিক্ষাদান করবার চেষ্টা করেন, তিনি ঠাণ্ডা লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন। খেলা-ধূলা, অভিনয়, সাহিত্য-সভা, সঙ্গীত, বিতর্ক ইত্যাদি বর্ত্তমানে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিক্ষক এইগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারলে ভালো।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্নকালে নানারকম আবিষ্কার, শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন ও বিষয়বস্তুর পুনর্লিখন হচ্ছে। শিক্ষকের নিজেরও গবেষণা, আবিষ্কার ও নানাবিধ পরীক্ষা করবার নিবূঢ় অধিকার আছে। তাই শিক্ষক এ

সম্বন্ধে অবশ্যই খোঁজ-খবর রাখবেন। এইজন্যে বই, পত্রিকা, খবরের কাগজ ইত্যাদি নিয়মিত পড়বার অভ্যাস তাঁর থাকবে। এছাড়া তিনি নিজে যেমন শিক্ষাদান করবেন, তেমনই চিরকাল শিখবেনও।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "নিজে শিক্ষালাভ করতে না থাকলে কোনও শিক্ষক কখনই যথার্থরূপে শিক্ষাদানকরতে পারেন না। নিজের শিক্ষা প্রজ্বলিত না থাকলে কোনও প্রদীপ অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে পারে না।"

জে. জে. ফিণ্ড্‌লে বলেছেন, "ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলে শিক্ষকের কাছে শিক্ষা আনন্দদায়ক হয়; কারণ, তিনি চিরশিক্ষার্থী।"

এভারেট্ ডীন্ মার্টিন্ বলেছেন, "যিনি সুশিক্ষক হতে চান, তাঁকে উত্তম ছাত্রও অবশ্যই হতে হবে। জ্ঞান বৃদ্ধির সর্ব্বোত্তম উপায় হল অধ্যয়নের অভ্যাস রাখা।" প্রকৃতপক্ষে "সুশিক্ষক সর্ব্বদাই শিক্ষালাভ করছেন এবং বিস্মিত হচ্ছেন, পর্য্যবেক্ষণ করছেন ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করছেন এবং একথা মনে করেন না যে, তাঁর বিষয় সম্বন্ধে সব জানা হয়ে গিয়েছে ও শিক্ষণীয় বিষয় চিরদিনের মত তিনি শিখে নিয়েছেন।"

কোনও কিছু শেখবার আগ্রহ শিক্ষকের যেন সর্ব্বদাই থাকে। তিনি এই ভাবই মনে পোষণ করবেন যে,

"বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র,
নানাভাবে নূতন জিনিষ শিখছি দিবারাত্র।"

পরিশেষে, শিক্ষকতাকে শিক্ষকের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। "শিক্ষকতা করছি এবং চিরকাল শিক্ষকতা করব"—তাঁর এই আদর্শ হওয়া উচিত। নিষ্ঠাবান্ শিক্ষক আত্মস্থ হয়ে কাজ করবেন এবং নিজে আদর্শ-স্থানীয় হবেন। প্রত্যেক শিক্ষক যদি এইরকম আদর্শ স্থানীয় হন, তাহলে আশা করা যায়, এই ক্ষীণ দীপশিখাই দীপান্তরে সঞ্চারিত হয়ে সারা দেশে দীপালির উৎসব জাগিয়ে তুলবে। অর্থাৎ, ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের জীবনের পুঞ্জীভূত মালিন্য ও শ্যামিকা দূর ক'রে, অনেক উন্নত ক'রে তুলবে। তাই, শিক্ষকের মন্ত্র হওয়া উচিত—

"তব জাগ্রত নির্ম্মল নূতন প্রাণ
ত্যাগ ব্রতে নিক দীক্ষা

বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা
নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান।
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান্॥"

নঈ তালিমের শিক্ষকের কাজ বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। নিষ্ঠাবান শিক্ষক আত্মস্থ হয়ে কাজ করবেন। চরকায় সূতা কেটে বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা তিনি দেবেন, প্রত্যেকে বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে যাতে শাক-সব্জী উৎপাদন করে, সে শিক্ষাও তিনি দেবেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘর-বাড়ী এবং সেই সঙ্গে রাস্তা-ঘাটও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে শিখবে। গ্রামের অধিবাসী যদি নিরলস ও তেজস্বী হয়, তাহলে জাতির মেরুদণ্ডও হবে শক্ত। শিক্ষককে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকতা করতে গিয়ে যদি তাঁর নেশা ধ'রে যায়, তবেই তিনি গ্রামের জন্যেও নিরলসভাবে কাজ করবেন। শিক্ষক নিজে যদি কার্পাস গাছ পুঁতে, চরকা কেটে বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হন এবং জমিতে তরি-তরকারী গাছ লাগান, অর্থাৎ তিনি নিজে আদর্শস্থানীয় হন, তাহলে গ্রামবাসীরাও একাজে উদ্বুদ্ধ হবে। তাঁকে জোর ক'রে কোনও কিছু করানোর প্রয়োজন হবে না। এভাবে তিনি গ্রামবাসীকে শিক্ষার ভেতর দিয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য-জ্ঞান, সাংস্কৃতিক-উন্নতি, সহযোগিতার প্রবৃত্তি, আলস্যশূন্যতা, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভে সহায়তা করতে পারেন।

শিক্ষক যেমন শান্ত পরিবেশে মুক্তপ্রাণে আনন্দের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেবেন, তেমনই শিশুও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় নিশ্চিন্ত মনে শিক্ষালাভ করবে। পরিকল্পিত আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লবে ইহাই হবে নঈ তালিমের শিক্ষকের দায়িত্ব। অর্থ-সাচ্ছল্য বা প্রাচুর্য্য হয়ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের থাকবে না। কিন্তু দেশের বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে ত্যাগস্বীকার করতে হবে। কাজে ব্রতী হ'য়ে তিনি যদি আনন্দ অনুভব করেন এবং নিজেও শিক্ষার্থীর মত বিকশিত হচ্ছেন—এই অনুভূতি যদি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের আসে তাহলে সমস্যার সমাধান হবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

গ্রন্থ, আগার ও গ্রন্থাগারিকের সার্থক সমন্বয় গ্রন্থাগারকে সম্পূর্ণ ক'রে তোলে। শিক্ষাদানের অপরিহার্য্য সরঞ্জামগুলির মধ্যে গ্রন্থাগারের স্থান অতি উচ্চে। শুধু পাঠ্যপুস্তক পাঠে মানব-মন পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না এবং জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনিবার্য্য। শিক্ষকের পরেই গ্রন্থাগারের স্থান। "The library is second only to the instructional staff in its importance for high quality instruction and research." রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মহাসমুদ্রের কল্লোলকে কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, ঘুমাইয়া-পড়া শিশুর মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই মহাশব্দের নীরবতাকে লাইব্রেরীর সহিত তুলনা করা যাইত।"

বিভিন্ন যুগে লক্ষ লক্ষ মানবের মনে যে ভাব ও চিন্তার উদয় হয়েছে এবং ভাষায় রূপ পেয়েছে, তা গ্রন্থাগারের সযত্নে সংগৃহীত হয়েছে। কত শত বছরের ইতিহাস, অসংখ্য জাতির উত্থান-পতন ও শত সহস্র মত ও পথের সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। কত জিজ্ঞাসা, মীমাংসা, জ্ঞান, চিন্তা ও কল্পনা ইত্যাদি এখানে রয়েছে। মানুষ বহু আশা-আকাঙ্খা নিয়ে গ্রন্থাগারে আসে, জ্ঞান আহরণ করে ও জীবন ধন্য করে। সমাজেও তার ফল মঙ্গলময় হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূরক গ্রন্থাগার।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে। মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।···হিমালয়ের মাথার ওপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপর দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব-হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" বিশ্বের ও ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানের সঙ্গে আমরা পুস্তকের

মারফতে পরিচিত হ'তে পারি। অন্যের মনের চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হ'তে পারি।"

সেক্সপিয়র বলেছেন, "লাইব্রেরী হচ্ছে আমার রাজত্ব, যে রাজত্বে আমার অপ্রতিহত গতি; যদি কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আমি মিলিত হতে চাই, তাহলে লাইব্রেরীই হচ্ছে একমাত্র উপায়; সেখানে কেউ আমাকে বাধা দিতে পারে না।"

যাঁদের বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ হয় না, গ্রন্থাগার তাঁদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় স্বরূপ। তাঁদের মনের বাসনা এখানে পূর্ণ হবে। মনীষী কার্লাইল বলেছেন, "A true University of these days is a collection of books." রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি গ্রন্থাগারের সাহায্যেই নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহও ছিল। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে গ্রন্থাগার-স্থাপন ও তার শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার অত্যল্প এবং সমস্যাও অসংখ্য। তাই, এক্ষেত্রে মনে হতে পারে ইহা "To put the cart before the horse" নীতির মত। কিন্তু বিষয়টি ঠিক তা নয়। বরং শিক্ষা বিস্তারের একটি উপায় হিসাবেই ইহা গ্রহণ করতে হবে। অন্য দেশের সঙ্গে একটু তুলনা করলে এ বিষয়ে আমরা কত বেশী পিছিয়ে আছি, তা বুঝতে পারা যাবে। যেখানে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রতি ব্যক্তি বছরে ১৮ খানি বই পড়েন, ভারতে সেক্ষেত্রে একজন একখানি বইয়ের $\frac{১}{১০০০}$ অংশ মাত্র পড়েন। ইংলণ্ডের শতকরা ৯৯ জন গ্রন্থাগারে পড়বার সুযোগ পান, আমাদের দেশে ঐ হার শতকরা মাত্র ১ জন। গ্রন্থাগারে বই পড়বার জন্যে ইংল্যাণ্ডে মাথা পিছু ১·০০ টাকা ব্যয় হয়। আমাদের দেশে সেক্ষেত্রে ব্যয় হয় মাত্র ১ পাই-এর ক্ষীণতম অংশ। সুতরাং প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্যে উদ্যোগী হওয়া দরকার। গ্রন্থ নির্ব্বাচনের সময় সুবিবেচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অধিকাংশ লাইব্রেরীই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্ত। আর বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না। ব্যবহারযোগ্য অন্য

চার আনা বইকে এই অতি স্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোনঠাসা করে রাখে।" এ অবস্থা কোনও গ্রন্থাগারের না হয়। সমস্ত বই-ই বাছাই-করা অর্থাৎ যেন সুনির্ব্বাচিত হবে। সমস্ত বিষয়েই বই রাখবার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন পাঠক তাঁদের নিজেদের রুচি অনুযায়ী বই চাইবেন, সে সমস্যা সমাধানের নির্দ্দিষ্ট কোনও নীতির কথা বলা সম্ভব নয়; কারণ স্থানভেদে ও পাঠকভেদে রুচির তারতম্য ঘটে। গ্রন্থাগারিক মন বুঝে তাঁর সঞ্চয়ের কথা জেনে এই সমস্যার সমাধান করবেন। তিনি পাঠককে অবশ্যই ভাল বই পড়তে অনুপ্রাণিত করবেন। রাস্কিন বলেছেন, "You might read all the books in the British Museum and remain an utterly illiterate uneducated person; but if you read ten pages of a good book letter by letter — that is to say with little accuracy, you are for evermore, in some measure an educated person." বই নির্ব্বাচনের সময়, "For every reader a book and for every book a reader"— নীতি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, গ্রন্থাগারও যেন সেইভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করে। সদ্‌গ্রন্থ সংগৃহীত হলে তা কোন-না-কোন কাজে লাগবেই। "Library should plan ahead of demand." এমন বই যেন রাখা না হয়, যা কোনও কাজে আসবে না। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আমাদের মনে রাখলে হয়ত সুফল পাওয়া যাবে।

"পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ 'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত
মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা
অস্বাদিত মধু যেমন যূথি অনাঘ্রাতা।"

বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা, নৈতিক দিক, বাঁধাই, বর্ণের আকৃতি, মূল্য ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে বই নির্ব্বাচন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৭০০ গ্রন্থাগার রয়েছে। বিদেশে গ্রন্থাগার ও তার পুস্তক সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী। মানুষের জানার আগ্রহ আগে যেমন

মারফতে পরিচিত হ'তে পারি। অন্যের মনের চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হ'তে পারি।"

সেক্সপিয়র বলেছেন, "লাইব্রেরী হচ্ছে আমার রাজত্ব, যে রাজত্বে আমার অপ্রতিহত গতি ; যদি কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আমি মিলিত হতে চাই, তাহলে লাইব্রেরীই হচ্ছে একমাত্র উপায় ; সেখানে কেউ আমাকে বাধা দিতে পারে না।"

যাঁদের বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ হয় না, গ্রন্থাগার তাঁদের কাছে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্বরূপ। তাঁদের মনের বাসনা এখানে পূর্ণ হবে। মনীষী কার্লাইল বলেছেন, "A true University of these days is a collection of books." রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি গ্রন্থাগারের সাহায্যেই নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহও ছিল। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে গ্রন্থাগার-স্থাপন ও তার শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার অত্যল্প এবং সমস্যাও অসংখ্য। তাই, এক্ষেত্রে মনে হতে পারে ইহা, "To put the cart before the horse" নীতির মত। কিন্তু বিষয়টি ঠিক তা নয়। বরং শিক্ষা বিস্তারের একটি উপায় হিসাবেই ইহা গ্রহণ করতে হবে। অন্য দেশের সঙ্গে একটু তুলনা করলে এ বিষয়ে আমরা কত বেশী পিছিয়ে আছি, তা বুঝতে পারা যাবে। যেখানে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রতি ব্যক্তি বছরে ১৮ খানি বই পড়েন, ভারতে সেক্ষেত্রে একজন একখানি বইয়ের ১/১০০০ অংশ মাত্র পড়েন। ইংলণ্ডের শতকরা ৯৯ জন গ্রন্থাগারে পড়বার সুযোগ পান, আমাদের দেশে ঐ হার শতকরা মাত্র ১ জন। গ্রন্থাগারে বই পড়বার জন্যে ইংল্যাণ্ডে মাথা পিছু ১·০০ টাকা ব্যয় হয়। আমাদের দেশে সেক্ষেত্রে ব্যয় হয় মাত্র ১ পাই-এর ক্ষীণতম অংশ। সুতরাং প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্যে উদ্যোগী হওয়া দরকার। গ্রন্থ নির্ব্বাচনের সময় সুবিবেচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অধিকাংশ লাইব্রেরীই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্ত। আর বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না। ব্যবহারযোগ্য অন্য

চার আনা বইকে এই অতি স্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোনঠাসা করে রাখে।" এ অবস্থা কোনও গ্রন্থাগারের না হয়। সমস্ত বই-ই বাছাই-করা অর্থাৎ যেন সুনির্ব্বাচিত হবে। সমস্ত বিষয়েই বই রাখবার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন পাঠক তাঁদের নিজেদের রুচি অনুযায়ী বই চাইবেন, সে সমস্যা সমাধানের নির্দ্দিষ্ট কোনও নীতির কথা বলা সম্ভব নয়; কারণ স্থানভেদে ও পাঠকভেদে রুচির তারতম্য ঘটে। গ্রন্থাগারিক মন বুঝে তাঁর সঞ্চয়ের কথা জেনে এই সমস্যার সমাধান করবেন। তিনি পাঠককে অবশ্যই ভাল বই পড়তে অনুপ্রাণিত করবেন। রাস্কিন বলেছেন, "You might read all the books in the British Museum and remain an utterly illiterate uneducated person; but if you read ten pages of a good book letter by letter — that is to say with little accuracy, you are for evermore, in some measure an educated person." বই নির্ব্বাচনের সময়, "For every reader a book and for every book a reader"— নীতি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, গ্রন্থাগারও যেন সেইভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করে। সদ্‌গ্রন্থ সংগৃহীত হলে তা কোন-না-কোন কাজে লাগবেই। "Library should plan ahead of demand." এমন বই যেন রাখা না হয়, যা কোনও কাজে আসবে না। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আমাদের মনে রাখলে হয়ত সুফল পাওয়া যাবে।

"পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ 'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত
মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা
অস্বাদিত মধু যেমন যূথি অনাঘ্রাতা।"

বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা, নৈতিক দিক, বাঁধাই, বর্ণের আকৃতি, মূল্য ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে বই নির্ব্বাচন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৭০০ গ্রন্থাগার রয়েছে। বিদেশে গ্রন্থাগার ও তার পুস্তক সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী। মানুষের জানার আগ্রহ আগে যেমন

ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। কারণ তার জ্ঞান পিপাসার কোনও শেষ নেই। তাই বিভিন্ন বিষয়ের বই রাখতেই হবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিকে সমৃদ্ধ করতে হবে। শিশুরা নিত্য নতুন বিষয়ে জানবার জন্যে আগ্রহী হবে। শিক্ষকদেরও তাই বই, পত্রিকা প্রভৃতি পড়ে এ বিষয়ে কিছু কিছু জানতে হবে। জ্ঞান নিশ্চল নয়, কবে কোথায় কি আবিষ্কৃত হচ্ছে, শিক্ষাজগতে কি পরিবর্ত্তন হচ্ছে, তা তাঁকে জানতে হবে। ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের শিশুদের জন্যে যে গ্রন্থাগার তাতে থাকবে ছড়া, সাধারণ জ্ঞান, জীবজন্তুর কথা, গল্প, রূপকথা, রামায়ণ ও মহাভারতের নির্ব্বাচিত কাহিনী, অভিযানের কথা, মহামানবের জীবনী, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের কিশোর-পাঠ্য সংস্করণ, ঐতিহাসিক কাহিনী ইত্যাদি। বড়দের জন্যে রুচি অনুযায়ী ভাল বই থাকবে।

গ্রন্থাগার অবশ্যই সুসজ্জিত ও আলোবাতাসপূর্ণ হবে। বিদ্যালয়ের সাধারণতঃ অধিকাংশ গ্রন্থাগারই অপ্রশস্ত ও আলোবাতাসহীন ঘরে থাকে। বইগুলি কোনও রকমে ঠাসাঠাসি করে রাখা হয় এবং গ্রন্থাগারের ভারও থাকে কোন শিক্ষক বা কেরানীর ওপর। ফলে, আসল উদ্দেশ্য প্রায়ই ব্যর্থ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হবে। যাতে পাঠক বসে পড়তে পারে, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বেশ খোলা জায়গায় মুক্ত তাক পদ্ধতিতে (open shelf system) বইগুলি যাতে সহজেই পাওয়া সম্ভব হয় এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে।

গ্রন্থাগারিক বইকে পাঠকের কাছে এবং পাঠককে বই-এর কাছে এনে দেন। তাই গ্রন্থাগারে যে বই থাকবে, সে সম্বন্ধে তাঁর অন্ততঃ পল্লবগ্রাহী জ্ঞান থাকলে ভাল হয়। অনেক সময় তাঁর মতামতের ওপর নির্ভর করে পাঠক বই গ্রহণ করেন। তিনি পাঠককে সুরুচির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর ব্যবহারে যেন পাঠক মুগ্ধ হন। তিনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী হবেন। তাঁর চেষ্টা, আগ্রহ ও নিষ্ঠা থাকলে নানা উপায়ে তিনি পাঠককে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রতি যাতে ছাত্ররা আগ্রহী হয়, তার জন্যে সপ্তাহে অন্ততঃ একটি পিরিয়ড গ্রন্থাগারের জন্যে রাখা যেতে পারে। শ্রেণীতে বই সাজিয়ে রাখা, মাঝে

মাঝে বই-এর প্রদর্শনী করা, শিক্ষকের অধিকতর পাঠের জন্যে বই-এর উল্লেখ করা ইত্যাদি উপায়ে ছাত্রদের দৃষ্টি বই-এর দিকে আনা যায়।

বিভিন্ন পত্রিকায় যেসব গ্রন্থ সমালোচনা হয়, সেগুলি পড়লে গ্রন্থ নির্ব্বাচনের পক্ষে সুবিধা হয়। পাঠকের রুচি ও চাহিদার তৃপ্তি হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। গ্রীক প্রবাদবাক্যে আছে যে, "Library is the medicine-chest of the soul." তাই, বই ছাড়া ছবি, শ্রাব্য-চাক্ষুষ উপকরণ (Audio-Visual materials), খবরের কাগজ, চার্ট, মডেল ইত্যাদিও রাখা দরকার। গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক খবরের সঙ্গে ওয়াকিবহাল রাখার জন্যে খবরের কাগজের কর্ত্তিত অংশ বা ছবি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কোনও দ্রষ্টব্য স্থানে রাখা যায়। বিদ্যালয়ের পত্রিকা, বিবরণী, মানচিত্র, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইত্যাদিও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে থাকবে। কোনও পত্রিকায় বিশেষ প্রবন্ধ থাকলে এক টুক্‌রো কাগজে তার পরিচয় দিয়ে চিহ্নিত করে দিলে অনেকেই আগ্রহ সহকারে পড়বে। গ্রন্থাগারের সঙ্গে যদি গ্রন্থাগারিকের বীণা-বাদকের সম্পর্ক হয়, তবে অনেক কিছুই সুকাজ হতে পারে! পাশ্চাত্ত্যের কোন কোন দেশে যান-বাহিত ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার আছে। সম্প্রতি আমাদের দেশেও ইহার প্রচলন হ'তে আরম্ভ করেছে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ছবি, চলচ্চিত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা হ'তে পারে। নিরক্ষরদের ওপর চলচ্চিত্র খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বিদ্যালয়ে যাঁরা পড়েন, তাঁরা পাঠ্যপুস্তক থেকে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেন, তা পুকুর থেকে জলের পরিচয় লাভের মত; তাই যাতে তাঁরা জ্ঞান-সমুদ্র থেকে তা আহরণ করতে পারেন, তার জন্যে গ্রন্থাগারের দরকার। পুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশন বলেছেন, "The guiding principle in selection should be not the teacher's own idea of what books the students must read but their natural psychological interests......The teacher's skill and efficiency will consist in his being able to direct what they are reading now to what they should be reading in due course."

একটি "অনুসন্ধান বই" রেখে দিলে পাঠকের প্রশ্ন আহ্বান করা যায় এবং তার উত্তর দেওয়া যায়। "কয়েকটি পড়বার মত বই", "গ্রন্থাগারিকের মতে ভাল বই" ইত্যাদি শিরোনামা দিয়ে বই পৃথকভাবে প্রদর্শন করলে পাঠককে আকৃষ্ট করা যায়। পাঠক যাতে বইয়ের যত্ন নেন, তার জন্যে গ্রন্থাগারের কতকগুলি নিয়ম থাকা দরকার।

ধর্ম্ম ও নঈ তালিমে তাহার স্থান

নঈ তালিমে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে ধর্ম্মের সংজ্ঞা সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। ধৃ ধাতু (ধারণ করা অর্থে), যা ধারণ ক'রে থাকে, যা সমাজের হিত বা শৃঙ্খলার জন্যে ধরে থাকে, তা-ই ধর্ম্ম। সমাজকে ধরে রাখবার জন্যে বিভিন্ন আচার, নিয়ম, কর্ম্ম-শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে অদৃশ্য এক শক্তি বিরাজমান ; তাঁর দ্বারা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। মহাবিশ্ব এক বিদ্যুৎ-তরঙ্গের (energy) খেলা। সৃষ্টি থাকলেই বুঝতে হবে স্রষ্টা আছেন। তাই তাঁকে পাবার জন্যে বা আস্বাদন করবার জন্যে, মানুষের অনন্ত পিপাসা রয়েছে। ধর্ম্মের গোড়ার কথা হল বিশ্বাস। "বিশ্বাসের সোনার কাঠিতে সমস্তই জীবন্ত হ'য়ে জেগে ওঠে। বিশ্বাস কোন রকম খণ্ডতা সহ্য ক'রতে পারে না। সে আপনার সৃজন-শক্তির দ্বারা সমস্ত ছিদ্র আচ্ছাদন ক'রে ঐক্য নির্ম্মাণের কাজে ব্যস্ত" (রবীন্দ্রনাথ)। বিশ্বাসী হয়ে অগ্রসর হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরে যাঁর বিশ্বাস আছে, তাঁকে আস্তিক, অবিশ্বাসীকে নাস্তিক এবং যাঁর আছে-কি-নাই সে সম্বন্ধে বিশ্বাস নেই, তাঁকে অজ্ঞাবাদী বলা হয়।

সাধক বলেন, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।" যে পথ অনুসরণ করলে অনন্ত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়, তা করতে হবে। আমাদের দর্শন একে অনুভূতি বলেছে। আমাদের ক্রমবিকাশের পথে বুদ্ধি অপরিহার্য্য, কিন্তু তার ওপর আছে স্বজ্ঞা (Intuition)। সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে তা র'য়েছে। ডার্‌উইন্‌ একে 'স্বজ্ঞার খেলা', মহাত্মা-গান্ধী 'Inner

Voice', রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অজানা' আর উপনিষদ বলেছেন, 'অবিজ্ঞাত'। শৈব ও ব্রহ্মোপসকরা তাঁর উপাসনা করেন 'পিতা', 'প্রভু', 'বিধাতৃ'-রূপে, শাক্তগণ 'মাতৃ'রূপে, বৈষ্ণব এবং বাউলরা 'বন্ধু', 'সখা', 'পতি', 'প্রিয়তম'-রূপে। বাউলরা বলেছেন, মনের মানুষ, অধর মানুষ, অটল মানুষ, সহজ মানুষ, আলোক মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ। তাঁকে যাঁরা অনুভব করেছেন, তাঁরা বিভিন্ন ভাষায় ও ভঙ্গিতে নিজ নিজ অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন।

দার্শনিক পাঠ্যপুস্তকে কোনও বিষয়ে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। দার্শনিক মতের প্রমাণ নেই। তাই নানামতের উৎপত্তি হয়েছে। লোকে রুচি অনুসারে পুনর্জ্জন্ম, স্বর্গ-নরক, নির্ব্বাণ, দ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, দেহাত্মবাদ প্রভৃতি ইচ্ছামত মানে।

'যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহাদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্‌বদ্‌ভূত সমাগমঃ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)।

—'মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একখণ্ড কাষ্ঠ অপর এক কাষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়, আবার দূরে চলে যায়। প্রাণিগণের মিলন বিরহও সেইরূপ।' আমাদের শাস্ত্রে আছে—'আত্মানং বিদ্ধি'—আত্মাকে জান।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, বিবর্ত্তন (Evolution) হচ্ছে, যা ছিল সংবৃত (involved), তার বিকাশ। জড়ের ভিতর থেকে প্রাণের প্রকাশ। মনের বিকাশ সম্ভব হয়েছে, কারণ জড়েই নিহিত ছিল প্রাণের ছন্দ, মনের ছন্দ। সৃষ্টি হচ্ছে আসলে জড়ের ভিতর দিয়ে পরম চেতন ভগবানের আত্মপ্রকাশ। মানুষের সৃষ্টি পর্য্যন্ত প্রকাশেই এই পৃথিবীতে তার নিজেকে প্রকাশের ধারার পরিসমাপ্তি হবে না। যে পূর্ণতার এষণায় জড়ের ভিতর থেকে প্রাণ ও মনের উৎস খুলেছে মানুষের অপূর্ণ জীবন-ধারায় পৌঁছে তার বিরতি ঘটবে না। মানুষের পর এই পৃথিবীতে তিনি ফুটাবেন তাঁর অতিমানস লোকের (Supramental) ঐশ্বর্য্য। এইবার তিনি সৃষ্টি করবেন দিব্য মানব।···দিব্যমানব হবে ভগবানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। যেমন একদিন প্রাণের স্তরের (পশুজগতের Vital plane-এর)

মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হয়ে বানর জাতীয় জীবকে আপন প্রকাশের ধারায় রূপান্তরিত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছে, তেমনি এক শুভ মুহূর্ত্তে অতি মানসলোক এই পৃথিবীর বুকে যোগ্য মানুষের আধারে আবির্ভূত হয়ে তাকে রূপান্তরিত করে গড়ে তুলবে মানবীয় দোষগুণ থেকে পৃথক এক ধারায়, ঐ অতি মানসলোকের প্রকাশছন্দে। তাকে দিব্য মানব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মানবীয় সমস্ত দোষ-ত্রুটি দুর্ব্বলতাযুক্ত এই জীবন হবে পরিপূর্ণ জ্ঞানে সমুজ্জ্বল। সর্ব্বসামর্থ্যে শক্তিমান পরম আনন্দময় রোগ-জরা-মৃত্যুহীন অমৃতময় ভাগবত বিগ্রহ। এই দিব্য মানবের ভিতর দিয়ে ভগবান তাঁর পরিপূর্ণ মহিমময় প্রকাশে সৃষ্টি সার্থক করবেন।

বিজ্ঞান বলে, ঈশ্বর যদি থাকেন তবে তিনি সর্ব্বব্যাপী, এরকম কথা বলা হয়। কিন্তু তা যদি হয় তবে তিনি এই অনন্ত কোটি সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করেন কি করে? প্রত্যেকটি সূর্য্য ঘূর্ণায়মান এবং কক্ষ-পরিভ্রমণকারী, যার সংখ্যা শুধু আমাদের বিশ্বেই পনর হাজার কোটি। এরকম হাজার হাজার কোটি সূর্য্য-সম্বলিত বিশ্ব মহাশূন্যে কত যে আছে, তার হিসাব করা দুঃসাধ্য। এমন অবস্থায় সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের কি অবস্থা, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এ-সবই মানুষের কল্পনার বাইরে। যেমন কল্পনার বাইরে—বিশ্ব সৃষ্টি হল কি ক'রে, এর আদি ইতিহাস কি? কেউ বলেছেন, অণ্ড থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হল। অণ্ড অর্থাৎ প্রকাণ্ড একটি আদিম পরমাণু—Primival Atom. তার বাইরে স্থান এবং কাল কিছুই ছিল না। Space ও time ঐ অণ্ড ফাটার পর জন্মেছে। এঁদের বলা হয়েছে বিবর্ত্তনবাদী। আর একদল বলেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আদিহীন। মহাজাগতিক ধূলি ও গ্যাস থেকে এক একটা জগৎ রূপ নিচ্ছে, আবার লয় পাচ্ছে। একটা ভাঙছে, আর একটা জন্ম নিচ্ছে। মোটের উপর যা ছিল তা-ই থেকে যাচ্ছে। এঁরা স্টেডি—স্টেটবাদী। এ এক মহাবিস্ময়—যেমন বিস্ময় পরমাণু জগৎ, তেমন বিস্ময় বিশ্ববস্তু জগৎ। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> 'আকাশভরা সূর্য্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
> তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
> বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥'

* * *

'জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥'

এই অদৃশ্য শক্তি, "মূকং করোতি বাচালং। পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।" বাইবেলে আছে, "Not a blade of grass grows except through the will of Lord." গীতাতেও ভগবানের উক্তি—

"ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

অর্থাৎ সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁর মায়া বা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির দ্বারা যন্ত্রের মত সমস্ত জীবকে পরিচালিত করছেন। তাঁকে অস্বীকার করার উপায় নেই। শ্রীঅরবিন্দ এই ঐশী শক্তিকে Supra-mental বলেছেন। এই স্তরে পোঁছলে তবেই এই রহস্য জ্ঞাত হওয়া যায়। C. E. M. Joad বলেছেন, "একজন দন্তবিশিষ্ট ব্যক্তি একজন দন্তহীন ব্যক্তিকে দাঁতের ব্যথার কথা বললে ইহার গুরুত্ব বা স্বরূপ যেমন তিনি বুঝেন না, তেমনি ঈশ্বরকে যিনি অনুভব করেননি, আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তাঁকে ঈশ্বরানুভূতি বোঝানো যাবে না। ইহা অনুভব করার বস্তু। তিনি বৃহৎ হতে বৃহত্তর, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর।"

পরম ব্রহ্ম আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। "ভগবদ্দর্শন চর্ম্ম চক্ষে কিছু দেখা নয়, কোন অলৌকিক ব্যাপার দেখাও নয়। ভগবদ্দর্শন অর্থে ভগবান যে সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে আছেন, তা উপলব্ধি করা। বিষয়তৃষ্ণা থাকবেই, যতক্ষণ না এই উপলব্ধি হয়—উপলব্ধি হলে তৃষ্ণাক্ষয় হয়।" ঈশ্বর আমাদের হৃদয়-মন্দিরেই আছেন। নখগুলি আঙ্গুলের যত কাছে তার চেয়েও বেশী কাছে তিনি আছেন। "তিনি ধর্ম্মের ধারক। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করলে সেই শক্তি বিপরীত বলে মনে হয়। আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম্ম পাই সে কখনই আমাদের ধর্ম্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভুত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাঁকে জন্মদান

করতে হয়, নাড়ির শোনিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয় ; তারপরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই, আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।"—(রবীন্দ্রনাথ)। "বাইরে যতক্ষণ ঈশ্বরকে অন্বেষণ করা যায়, ততক্ষণ তাঁর সত্তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না ; এবং তাঁহার সঙ্গে প্রকৃত যোগও স্থাপিত হয় না। তিনি যতক্ষণ বাহিরে, ততক্ষণ আমা হইতে দূরে। যে শাসন-শক্তি বাহির হইতে আসিয়া শাসন করে, তাহার ভিত্তি ভয়ের উপরে ও তাহাতে বিধি পালনের দিকে অধিক দৃষ্টি থাকে। এই কারণেই বোধ হয় য়িহুদীদিগের মধ্যে বিধিপালনের ভাব এত প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক, ঈশ্বরের মহিমা বোধ করিবার জন্যে যেমন মন ভিতর হইতে বাহিরে যাত্রা করে, তাহার স্বরূপ প্রকৃতভাবে লক্ষ্য করিবার জন্যে আবার তেমনি বাহির হইতে ভিতরে যাত্রা করিতে হয়, তাঁহাকে আত্মমন্দিরে অন্বেষণ করিতে হয়।"—(আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী)। সেই সর্ব্বসত্ত্বা অনুভব করার বস্তু। শাস্ত্রে আছে, "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"—(ঈশোপনিষৎ)। অর্থাৎ জগতে যা কিছু অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল বিষয় আছে, তা সমস্তই ঈশ্বরময় বলে জ্ঞান করবে। "He, who has learnt to meditate, finds it hard to belive in God ; yet it is only through faith that one can live in God"—(Leo Tolstoy). "যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"—এই যা কিছু সমস্তই পরম প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে।" "তিনি এক, জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বস্রষ্টা, মহাত্মা, সর্ব্বজীবের হৃদয়ে সতত বিদ্যমান"—(উপনিষদ্)।

একদিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে বলতে হয়, ধর্ম্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছলে তা অনুভূত হয় না এবং সে সম্বন্ধে বলার অধিকারী হওয়া যায় না। সাধকের নিকট সেই মহাশক্তি যে পদ্ধতিতে আস্বাদিত হন, সেইভাবে সাধক তা ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন। এইভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর অনন্ত, তাই কারও জানা চরম নয়। ধর্ম্মে অহঙ্কার থাকা শুধু এই কারণেই উচিত নয়। অন্ধ ব্যক্তির স্পর্শ দ্বারা হাতীর সম্বন্ধে ধারণা করার মত সব

সাধকের উক্তিই সত্য। শান্ত মনোভাব নিয়ে বিচার করলে বিরূপ মনোভাব আসতে পারে না। সকলেই সেই বিশ্বসত্ত্বার অংশ, তাঁর কোন পৃথক সত্তা নেই।

"Though difference be none, I am of Thee
Not Thou O Lord of me,
For of the sea is verily the wave
Not of the wave the sea."

"মুক্তি কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে অন্বেষণ এবং লাভ করতে হয়। যাঁরা এই শ্রমে কাতর, যাঁরা নিজেদের চিন্তা ও অন্বেষণের ভার অপরের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে বৃক্ষের তলে ছায়ায় বসে ধর্ম্মের সুখভোগ করতে চান, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন সেই শ্রমকাতর ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিদের জন্যে নয়। মানব-শিশু যেমন উঠে-প'ড়ে হাঁটতে শেখে, তদ্ভিন্ন হাঁটতে শেখবার অন্য উপায় নেই, তেমনি হে মানব, তোমাকেও অনুসন্ধান, তত্ত্বচিন্তা, আত্মদর্শন,পাপ ও প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম, অনুতাপ, অশ্রুপাত প্রভৃতির পথ দিয়ে ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে ; এতদপেক্ষা সহজ পথ নেই। যদি এই আয়াস স্বীকারে অসম্মত হ'য়ে সহজ পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, তবে তুমি প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন থেকে বঞ্চিত হ'লে। ধর্ম্ম-জীবনের প্রাণ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন তত্ত্বান্বেষণ"—(শিবনাথ শাস্ত্রী)। "হৃদয় খুলিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে হইবে। তীর্থ বা মন্দিরাদিতে তিলক করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্র-বিচিত্র করিয়া চিতা বাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙে তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক করে না। ধর্ম্মের সাক্ষাৎ করিলেই তবে কাজ হইবে। বাহিরের রঙ আড়ম্বরাদি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্ম-জীবনে সাহায্য করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলির উপযোগিতা আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলি থাকুক, ক্ষতি নাই, কিন্তু সেগুলি আবার অনেক সময় শুধু অনুষ্ঠান-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায় ; তখন তাহারা ধর্ম্মজীবনের সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্ন

করে। লোকে এই বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির সহিত ধর্ম্মকে সমানার্থ করিয়া বসে। তখন মন্দিরে যাওয়া ও পুরোহিতকে কিছু দেওয়া ধর্ম্মজীবনের সহিত সমান হইয়া দাঁড়ায়; এইগুলি অনিষ্টকর; ইহা যাহাতে নিবারণ হয়, তাহা করা উচিত। আমাদের শাস্ত্র বারবার বলিতেছেন, ধর্ম্ম কখনো বহিরিন্দ্রিয়ের জ্ঞানের দ্বারা লাভ হইতে পারে না, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষয় পুরুষের সাক্ষাৎ করায় আর এই ধর্ম্ম সকলেরই জন্য”—(স্বামী বিবেকানন্দ);

“আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। চিত্ত যখন যেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে, তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে ব'ার হয়, তেমনি সে বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তি বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে, আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্ব্বত্রই প্রকাশ পায়।”—(রবীন্দ্রনাথ)।

“প্রীতিই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, প্রীতি দ্বারা তাহা রক্ষিত হইতেছে। ঈশ্বর আপনার আনন্দ অন্যকে বিতরণ করার জন্য জীবের সৃষ্টি করিলেন, তিনি এখানে সকলকে আপনার স্নেহের গুণে বদ্ধ করিয়া জননীর ন্যায় সকলকে পালন করিতেছেন। প্রীতিতে আমরা জীবিত রহিয়াছি, প্রীতি আমাদিগের সকল উদ্যম, ভাব ও কার্য্যের মূল; প্রীতি দ্বারা আমাদিগের মন ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। প্রীতি নিরাকার পদার্থ। গাঢ় হস্ত স্পর্শ, প্রফুল্লতার ঈষৎ হাস্য, অমৃতময় মধুর শব্দ, বন্ধুর প্রীতি প্রকাশ করে। কিন্তু সে সকল প্রীতি নহে, সে সকল অন্তরস্থ প্রীতির বাহ্য চিহ্ন স্বরূপ। প্রীতি স্বয়ং নিরাকার পদার্থ; কিন্তু জীবন, যৌবন, ধন, মন, প্রাণ সকলই উহার বশীভূত। প্রীতি সুখের সার। তাহা আমাদিগের চিত্তকে পরিত্যাগ করিলে সকলই নীরস বোধ হয়; আমরা জীবনে যেন মৃতপ্রায় হইয়া থাকি।”—(রাজনারায়ণ বসু)।

“পশু পক্ষী মানবেরে সমভাবে
ভালবাসে যেই,
ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
প্রার্থনাও করে থাকে সেই”—(কোল্‌রিজ্)।

গান্ধীজী বলেছেন, "মানবজাতির কল্যাণের দ্বারাই আমি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি, ঈশ্বর ঊর্দ্ধাকাশে বা পাতালে বাস করেন না। তিনি প্রতি মানুষের মধ্যেই বিরাজমান।"

"আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছেন। দ্বেষাদ্বেষির দরকার নেই। কেউ বলেছে সাকার, কেউ বলেছে নিরাকার। আমি বলি যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক, তবে এই বলি যে, মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) ভাল নয়, অর্থাৎ আমার ধর্ম্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা. এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে,—এ ভাব ভাল। কেননা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বলতেন, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাবা। 'কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।' হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং তোমরা সকলেই এক বস্তু চাইছো। তবে যার পেটে যা সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। কি জান? দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ। মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তিভরে একটি মত আশ্রয় করলে, তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। যদি কোন মত আশ্রয় করে, তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভুল শুধ্‌রিয়ে দেন।" —(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস)। সব ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই এক, কেবল পথ ভিন্ন। সুতরাং, এ সম্বন্ধে বাক্‌-বিতণ্ডার চেয়ে, যে-কোন একটি পথ অবলম্বন করে অনুসরণ করাই যে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, একথা স্মরণ থাকলে, আর পথ নিয়ে গোলমাল হয় না।

"সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? আমি দেখেছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার অযোধ্যা। রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর বল্লেন 'আমি সংসার ত্যাগ করে যাব।' দশরথ তাঁকে বুঝবার জন্যে বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বল্লেন, 'রাম আমার সঙ্গে বিচার কর, তারপর সংসার ত্যাগ করো।' আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয়, তুমি ত্যাগ করো। রাম দেখলেন, ঈশ্বরই জীব, জগৎ সব

হয়েছেন। তাঁর সত্তাতে সমস্ত সত্য বলে বোধ হচ্ছে, তখন রামচন্দ্র চুপ ক'রে রইলেন। সংসারে কাম, ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।"—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস)।

জীবনের উদ্দেশ্য হইল অসীমের সঙ্গে আন্তরিক যোগ সাধন, বিশ্বাত্মার সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন। ইহা সেই সত্যম্ শিবের ধ্যান এবং উহার উপলব্ধি দ্বারাই সম্ভব। শিক্ষার কাজ হইতেছে সঠিক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূল্য বা আদর্শ অনুসন্ধানে আমাদের সাহায্য করা। এই ভাবেই যাহা বিশ্বজগতের সত্য তাহা আমাদেরও সত্য হইয়া উঠে এবং আমাদের জীবনে শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে।

গান্ধীজী এ সম্বন্ধে যা অনুভব ক'রেছেন, তা জানিয়েছেন ; ইহাই নঈ তালিমী ধর্ম্ম। নঈ তালিমে কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মের স্থান নেই। সব ধর্ম্মের মূল এতে আছে ; আচারকে বাদ দেওয়া হ'য়েছে, কেবল সাধারণ প্রার্থনা আছে। কাউকেও আঘাত করা এর উদ্দেশ্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হ'ল সব ধর্ম্মের মহা সম্মিলন। জীবনযাপন যদি ধর্ম্ম হয়, প্রেম যদি ধর্ম্ম হয়, পারস্পরিক প্রীতিকে বাস্তবরূপ দেওয়া যদি ধর্ম্ম হয়, তাহলে সর্ব্ব ধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ বলে তিনি মনে করেন। প্রকৃত ধর্ম্ম কখনো ঘৃণা বা হিংসা করতে শিক্ষা দেয় না। সর্ব্বজীবের হিতসাধনই প্রকৃত ধর্ম্ম। মূর্ত্তি-পূজাকে এই ধর্ম্ম সমর্থন করে না। ব্রহ্ম অনন্ত ও নিরাকার। পরম সত্ত্বা কত বিরাট, কি গভীর ধীশক্তির তিনি আধার ; আর মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য। পরম সত্ত্বার কোন বিশেষ রূপ নেই। তিনি বিশ্বের সকল রূপের মধ্যেই ব্যাপকভাবে বিরাজমান ; বিশিষ্ট কোন রূপ তাঁর নেই ; এই অর্থে তিনি অরূপ। "বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রয়েছেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন। মনই নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করে—আপনাকে চরিতার্থ করে"—(রবীন্দ্রনাথ)। তাঁকে যে ভাবেই আরাধনা করা যাক না কেন, তিনি তা গ্রহণ করেন।

সমুদ্র থেকে জল তুলে এনে যে পাত্রে রাখা যায়, তা সেই আকার ধারণ করে এবং বিন্দু পরিমাণ জলেও সমুদ্র-জলের সব গুণ থাকে।

সেই মহাবিদ্যুৎ রাশিও সেইরকম বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন মাত্র। মানুষকে যা বাঁচিয়ে রাখে, মানুষ যাকে অবলম্বন করে টিকে থাকে এবং যা সমগ্র বিশ্বময় ওতঃপ্রোতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, তা-ই ধর্ম্ম। তার বিভিন্ন বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে মানুষ ধর্ম্মের সংজ্ঞা খুঁজেছে। উপনিষদ বলেছেন, "আনন্দ থেকেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবনযাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। বিশ্বজগতের এই আনন্দ-সমুদ্রে কেবলই তরঙ্গ-লীলা চলেছে, প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ থেকেই জেগে উঠেছে, আনন্দ থেকেই তার যাত্রারম্ভ। তারপর কর্ম্মের বেগে সে যতদূর পর্য্যন্তই উত্থিত হয়ে উঠুক না, এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে, সে অনন্ত আনন্দ-সমুদ্রেই তার নীলা চলেছে—তারপর কর্ম্ম সমাধা করে আবার যে সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়"—(রবীন্দ্রনাথ)।

ব্রহ্ম অন্তরের দ্বারে অবিরত আঘাত করছেন। কার দ্বার কখন খুলে যায় বলা যায় না। অনন্তকাল ধরে ব্রহ্মাকে আস্বাদন করবার জন্যে জীবের অনন্ত পিপাসা রয়েছে। সাধনার দ্বারা তাঁর নিকটতম হওয়া যায়। নিরাকারকে ভজন করা সম্ভবপর নয় মনে করে মূর্ত্তি বা প্রতীকের কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। সমুদ্র-জল কিঞ্চিৎ পরিমাণে কোনও পাত্রে তুলে আনলেও ইহাতে যেমন সমুদ্র-জলের পূর্ণ গুণ থাকে, তেমনি মূর্ত্তি-পূজারও সার্থকতা থাকতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যে যেথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈচ ভজাম্যহম্।" আত্মোপলব্ধি ব্যতীত কোনও জিনিষ বেশীদিন ভাল লাগে না। তাই প্রার্থনায় শ্লোক নির্ব্বাচন করা হ'য়েছে। সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় এই নঈ তালিমী ধর্ম্ম। পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা এর অন্যতম প্রধান দিক। অন্য ধর্ম্মকেও ইহা শ্রদ্ধা করে।

সামুদায়িক জীবন-যাপনের জন্যে, সর্ব্বধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মূল সুর বজায় রেখে, একটি সমন্বয় করা হ'য়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, প্রেম, প্রজ্ঞা, সহানুভূতি পাঠ্যসূচীর অংশ করা যায় না; আমরা বাইবেল

শিক্ষা দিতে পারি, কিন্তু যোগী-শ্রেষ্ঠ ভগবানের অনন্ত জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি না। যদিও এসব শেখানো যায় না। তবু এর সঙ্গে শিশুর যোগসাধন করা সম্ভব; তবে, বক্তৃতা দিয়ে নয়, নিজের জীবনে পালন ক'রে। শিশুর যখন বর্ণ পরিচয় হয়, তখন সে প্রথমে গুরুমহাশয়ের লেখা দাগা বুলিয়ে লিখতে শেখে, কিন্তু পরে সে গুরু মহাশয়ের চেয়েও উত্তম লিখতে পারে। সেই রকম ঈশ্বরকে পাবার জন্যেও কোন নির্দ্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে যেতে হয়।

"ধর্ম্মবোধের এই মাত্রা—এর প্রথম জীবন, তারপরে মৃত্যু, তারপরে অমৃত।……আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে, তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্ম্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আরেক দিকে অদ্বৈত্য; একদিকে বিচ্ছেদ, অপর দিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আরেক দিকে মুক্তি। যার জন্যে শক্তি ও সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম, এক হয়ে গিয়েছে। যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তিকে মানে, মনের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে"—(রবীন্দ্রনাথ)।

বেদের বাণী হল—'কো বেদঃ' অর্থাৎ কে জানে? যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন কিংবা জানেন না? এমন সন্দেহের বাণী বোধ হয় আর কোন শাস্ত্রে প্রকাশ হয় নি। যাঁর সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে জানেন না। সৃষ্টি তাঁকে বহন ক'রে নিয়ে চলে। আসল কথা, চরম প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মাতা যেমন একমাত্র মাতৃ-সম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর অব্যবহার্য্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম্ম করি।"

পরম সত্তার আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রকট প্রকাশ হল মানবরূপে। নিখিল মানবকে সেবা করলেই তাঁর সেবা করা হয়। নিখিল মানবের কল্যাণ-কর্ম্ম করলেই তাঁর কল্যাণ করা হয়। তিনি বিশেষ করে আছেন—যারা সর্ব্বহারা, যারা অবহেলিত, যারা নগণ্য, যারা কঠোর পরিশ্রম করে ক্ষুধার অন্ন আহরণ করে—তাদের মাঝখানে।

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
ক'রছে চাষা চাষ।
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস"।

"The true way of serving God is to do good to man" হাফেজ। গান্ধীজী বলেছেন—"The highest moral law is...... that we should unremittingly work for the good of mankind. ......Another feature of moral is that it is external and immutable." মহাভারতে আছে যে, "পরিনির্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীত মিদমেব হি। নোপকারাৎ পরো ধর্ম্মো নাপকারাৎ পরং অঘম্" অর্থাৎ, 'ধর্ম্ম বিষয়ের যত কচ্‌কচি বা বাগ্‌জাল, সে সমস্ত মন্থন ক'রে এই সার কথা উদ্ধার করা গেল যে, পরের উপকার করার চেয়ে বড় ধর্ম্ম নেই, পরের অপকার করার চেয়ে বড় পাপ আর নেই।'

গান্ধীজী বলেছেন—"Religion is to morality what water is to seed that sown on the soil." A. N. Whitehead বলেছেন—"A religious education is an education which inculcates duty and reverence. Duty arises from our potential control over the course of events." শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সমগ্র সত্তার বিকাশ সাধন। তাই তার ধর্ম্মীয় বিশ্বাস বা নৈতিক বোধও দরকার। এতে তার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং সে সামঞ্জস্য স্থাপনের শক্তি অর্জ্জন করবে। বিদ্যালয়ে যেমন নানা বিদ্যাচর্চ্চা, খেলাধূলা, কর্ম্মোদ্যম সচেতনভাবে কাজ করবে, তেমনি অচেতনভাবে একটি শান্তি,

উৎসাহ, শুভবুদ্ধি, প্রীতি, ক্ষমা ও আনন্দের পরিবেশও থাকবে। সেই সংজ্ঞাতীত পরিবেশের মধ্যেই বিদ্যালয়ের প্রাণ-কোরক নিহিত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"Religion is the innermost core of education." গান্ধীজী বলেছেন, "আমাদের সব কাজে—আহারে, বিহারে, চিন্তায়—আমাদের জাগ্রত প্রহরে যদি আমরা প্রত্যেকে সত্য পথ অনুসরণ করতে পারতাম, তবে সে কি আনন্দেরই হত।"

"Serene will be our days and bright
And happy will our nature be
When love is an unerring light,
And joy its own security."

"ন্যায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃনুতে তেন লভ্যঃ।"

আত্মা প্রবচন বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা লাভ হয় না। মেধা বা বহুশাস্ত্র পাঠের দ্বারাও হয় না। এই আত্মা বা পুরুষ যাকে বরণ করে বা যার উপর অনুগ্রহ করে, তার দ্বারাই লাভ হয়। 'সত্যেন হি লভ্যঃ'—উপনিষদের এই বাক্য গান্ধীজীর জীবনে সার্থক হয়েছিল। মহাত্মাজী ছিলেন পরম ভগবদ্ বিশ্বাসী। তিনি বলতেন, "যে সমস্ত ধর্ম্মজগতের মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই ছদ্মবেশী রাজনীতিবিদ্, আর আমি যদিও রাজনীতির মুখোস পরে আছি, তথাপি বাস্তবে আমি একজন ধর্ম্মজগতের মানুষ।...আমার যা কাম্য, যার জন্যে গত ৩০ বছর ধরে প্রাণপণ চেষ্টা ও আকুল আকূতি করছি, তা হচ্ছে আত্মদর্শন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ও মোক্ষ। আমার চলাফেরা কাজকর্ম্ম সমস্তই এই দৃষ্টি হ'তে। এমন কি রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ও এই উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত।" মহাত্মাজীর ধর্ম্মমতে কোনও গোঁড়ামি ছিল না। প্রতিদিনের প্রার্থনায় তিনি বলতেন—'সর্ব্ব ধর্ম্মে সমানত্ব।'

"Fundamental principles of ethics are common to all religion. These should certainly be taught to the

children and that should be regarded as adequate religious instruction so far as schools under the Wardha Scheme are concerned."

"নঈ তালিমের শিক্ষক তখনই সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারিবেন যখন প্রকৃতই তাঁহারা সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী হইবেন। তখন চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি তিনি কঠোরতম হৃদয়কেও আকর্ষণ করিতে পারিবেন।" সাধুতা, বাধ্যতা, আনুগত্য, মন, চিন্তা ও কথায় পবিত্রতা, দয়া, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সাহস ইত্যাদি গুণের বিকাশ হবে। "নৈতিকতা হচ্ছে সাধারণ জীবনেরই একটি অংশ, ইহা হচ্ছে বাহ্য আচরণকে কতকগুলি মানসিক বিধি-নিষেধের দ্বারা চরিত্রকে এক মানসিক আদর্শের অনুযায়ী গঠিত করা।" (শ্রীঅরবিন্দ)। "কোন মানুষই প্রকৃতপক্ষে দুর্ব্বল নয়। অন্তরদেবতাকে অস্বীকার না ক'রে তার অস্তিত্বে আস্থাবান হও, দেখবে মনের সব আবর্জ্জনা ভস্মীভূত হ'য়ে, অন্তরে প্রসুপ্ত অনন্ত শক্তি প্রচণ্ড তেজে জাগ্রত হয়ে উঠবে।"—স্বামী বিবেকানন্দ।

"স্বার্থ আমাদের যে প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীব প্রকৃতিতে। যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষত্ব,"—রবীন্দ্রনাথ (মানুষের ধর্ম্ম")।

সত্য ও ন্যায়ের পথে মানুষের দৈনন্দিন কার্য্য-প্রণালীর ভিতর দিয়ে যদি আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়, তাহলে তাকেও ধর্ম্ম বলা যায়। আর এক দৃষ্টিতে—অহিংসার ভিত্তিতে মানুষকে সেবা করতে হবে; মানুষকে এমনভাবে ভালবাসতে হবে, যার ফলে, তার মধ্য দিয়েই ভগবানের প্রত্যক্ষরূপ ফুটিয়ে তোলা যায় এবং সেটাই হবে আমাদের ধর্ম্ম। যুক্তি দিয়ে কেউ কোন দিন ধর্ম্ম অনুভব করেনি। স্বীয় সূক্ষ্ম অনুভূতি বা অতুল জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত যিনি, তিনিই ভগবানের আরাধনা করেন। ভগবান আলোরূপে তাঁর অমৃত বাণী তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরেন। বুদ্ধদেব প্রভৃতি এই সত্যের বাণী প্রচার করেছিলেন। ধর্ম্মের মূল কথা "ঈশা বাস্যমিদং"। বহু গবেষণা ও চিন্তা ক'রে ও বৈজ্ঞানিকরা এই অখণ্ড শক্তিকে অস্বীকার করতে পারেননি। দুঃখের বিষয় এই যে, "আমাদের

জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ সব গিয়েছে, এসেছে ছ্যুৎমার্গ। ধর্ম্ম এখন পৌঁছেছে ভাতের হাঁড়ি আর জলের কলসীতে।" অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গ নয়। অধিকন্তু, ইহা হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট একটি পচনশীল পদার্থ। মানুষ ইহাকে ধর্ম্মের অঙ্গ ধরে তার মাহাত্ম্য নষ্ট ক'রে দিয়েছে। বুদ্ধেরও বাণী ছিল সর্ব্বজীবে দয়া, সকলের প্রতি অহিংসা, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে চরম হিংসাত্মক কাজের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ভারতকে তার নৈতিক আদর্শে পৌছতে হ'লে আমাদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তেই হবে।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় শিশু শান্ত পরিবেশের মধ্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, যাতে তিনি তাদের সুমতি দেন। তারা বলে—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।
* * *
সবার পানে যেথায় বাহু পশারো
সেইখানেতে প্রেম জাগিবে আমারও।"

তারা যখন গান করে, 'তোমারি গেহে, পালিছ স্নেহে', 'আঁকা তোমার চরণ রেখা', 'তুমি আমাদের পিতা', 'বল দেখি ভাই এমন ক'রে' প্রভৃতি, তখন এক এবং অদ্বিতীয়ের প্রতিই তারা ভক্তি নিবেদন করে। ভগবৎ সাধনায় ভক্তির লক্ষণ নয় রকম—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্।"

সুতরাং, তাদের সাধ্যানুযায়ী তারা তাঁর আরাধনা করে। তাদের মনে গেঁথে থাকে যে,

"বিদ্যার সমান চক্ষু নাই এ সংসারে,
সত্যের তপস্যা জেনো শ্রেষ্ঠ চরাচরে,
লোভ আর আসক্তিতে যত দুঃখ পাও,
ত্যাগের চেয়েও সুখ পাবে না কোথাও"।

—(মহাভারত)।

"ইন্দ্রির-সংযম ও দুষ্প্রবৃত্তি-দমন শিক্ষা না ক'রে কেবল বিজ্ঞান শিক্ষা দ্বারা ভোগের দ্রব্য ও রোগের ঔষধ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ক'রতে পারলেও মানুষ কখনও সুখী হতে পারে না।"—(গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

তাই বলা হয়েছে,—

"ঈশ্বরকে ভয় করো
পাপকেও ভয় হবে তবে,
জ্ঞানের সোপান ইহা
স্থির জেনো দুঃখময় ভবে।" (নিউ টেস্টামেণ্ট)।

শান্তির শিক্ষা

সাম্প্রতিক কালে দেখা যাছে যে, একদিকে কয়েকটি শক্তিশালী দেশ বিভীষিকাময় মারণাস্ত্র তৈরী ও তার পরীক্ষায় ব্যস্ত রয়েছে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় রাষ্ট্র অহিংসার বাণী প্রচার করছে। পরস্পর বিপরীত-ধর্ম্মী এই দুইটির মধ্যে কোন্ পথে বিশ্বশান্তি সম্ভব, তা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

বিরোধ আদি কাল থেকেই চলে আসছে। তবে ক্রমশঃ যুদ্ধের রীতি-নীতি আমূল পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কেউ কেউ তৃতীয় বিশ্বসমরের আশঙ্কা করছেন এবং তাহলে হয়তো মানব জাতির অস্তিত্বই লোপ পাবে।

এখন আমাদের স্থির করতে হবে, কোন্ পথ আমাদের বাঁচাবে ? যুদ্ধ, না, অহিংসা ? এর উত্তরে হয়তো বলা অসঙ্গত হবে না যে, অহিংসাই একমাত্র পথ।

হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, দ্বিধা, দ্বন্দ্বের পাপ-বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবী। শান্তি, মৈত্রী, অহিংসা, ন্যায়, নীতি, তপস্যা, ত্যাগ, সংযম ও সত্যের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে অশান্তি, দুর্নীতি, ও হিংসার প্লাবনে মানব-সমাজকে ভাসিয়ে নিতে আসুরিকতায় মত্ত একদল মানুষ যুগে যুগে সচেষ্ট।

যখনই কোন জাতির মধ্যে চতুরতা, গোপনতা ও সুবিধান্বেষণ দেখা যায়, তখনই তার ফল স্বরূপ বিদ্বেষ, হিংসা ও রক্তপাত অনিবার্য্যরূপেই

দেখা দেয়। বিজ্ঞানের উন্নতির বলে এখন মারণাস্ত্রের মহড়া চালানো হ'চ্ছে। এতে মানবজাতির হৃদ্‌কম্প হ'চ্ছে। একের কথা অন্যে বিশ্বাস করে না; পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করছে। তাই, জাতিসঙ্ঘ, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ হওয়া সত্ত্বেও বর্ব্বরতার চরম প্রকাশ আমরা চোখের সামনে দেখেছি। হিংস্র থেকে হিংস্রতর যুদ্ধের পরিচয় আমরা পেয়েছি। ভবিষ্যতে হয়ত অতি ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র তৈরী হবে অথবা Cosmic Rays যুদ্ধাস্ত্রের কাজে লাগবে। যদি এইভাবে দ্বেষ, হানাহানি, চতুরতা, কুটনীতি চলতে থাকে, তাহলে শান্তির আশা করা বৃথা।

বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়েরই পরিপোষক। একদিকে ইহা জীবনের রক্ষক ও পরিবর্দ্ধক এবং অপরদিকে সংহারক। ইহার একহাতে খর্পর এবং অন্যহাতে বরাভয়—বিশ্বশান্তিরূপিনী জগন্মাতার মূর্ত্তির মত। মানুষ বিজ্ঞানের চালক ও প্রতিপালক। যন্ত্র তিন রকম— সংহারক, সময় সাধক ও উৎপাদক। যন্ত্র পূরক অথবা মারক হ'তে পারে। অগ্নি দ্বারা গৃহদাহ ও রন্ধন-দুই-ই চলে। তেমনি, মানুষের অধ্যাত্মশাস্ত্রই বিজ্ঞানকে পথ প্রদর্শন করবে।

এখনকার যুদ্ধে হয়তো ব্যবহৃত হবে—মেশিন গান, দূরক্ষেপী কামান, টরপিডো, সাবমেরিণ, বোমাবর্ষী বিমান ও পরমাণু বোমা। তাই লোকক্ষয়কারী বিশ্বসমর থেকে অধিকাংশ লোকই পরিত্রাণ পেতে চায়। ভবিষ্যতে মহামারী বীজ-ছড়ানো, গ্যাস বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গও ব্যবহৃত হতে পারে। আসলে মানুষ অন্তঃপ্রকৃতিকে সংযত ক'রতে পারেনি। একদল লোকের কাছে বিজ্ঞান ভয়ঙ্কররূপে দেখা দিয়েছে। নৃশংস-যুদ্ধাস্ত্র, ফস্‌ফরাস বোমা, চালকহীন বিমান, শব্দভেদী টরপিডো ইত্যাদির কথাও সকলেই জানেন। কামনা অসংযত হলে মানুষের অকল্যাণকে ডেকে আনা হবে। বায়ুমণ্ডলে অমিতশক্তি ত্রিশ মেগাটন বিস্ফোরিত হ'লে তার ফল কি হয়, তা আমরা জানি। এর ফলে, বিস্ফোরণ স্থলের নিচ থেকে ১২ মাইলের মধ্যে সমস্ত ঘরবাড়ী পুড়ে ছাই হবে, চল্লিশ মাইলের মধ্যে সমস্ত দাহ্য পদার্থে আগুন লাগবে, ৪৫ মাইলের মধ্যে অনাবৃত প্রত্যেকটি দেহ অগ্নিদগ্ধ হবে, সে অগ্নি-গোলকটির ব্যাস

হবে প্রায় ৪ মাইল। বিকিনিতে যে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছিল, তার ফলে বহু দূরস্থ জাপানী জেলেরা ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়েছিল।

যদি ব্যাপকভাবে আণবিক যুদ্ধ হয়, তাহলে সমগ্র মানব-সমাজ নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, তাহলে তার ফল উভয় পক্ষে তো বটেই, সারা বিশ্বের পক্ষে ও মারাত্মক হবে।

লোকক্ষয়কারী তৃতীয় মহাসমর থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রায় সকলেই চায়। তাই আমাদের বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে, কোন্ পথ মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর।

কেউ কেউ মনে করেন যে, সর্ব্বজনস্বীকৃত নিরস্ত্রীকরণ বা অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস বা নিষিদ্ধ মারণাস্ত্র সৃষ্টির কাজ বন্ধ করা প্রভৃতির দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক সম্প্রীতি আনা সম্ভব। এতে মানুষের মন থেকে ভয় কিছু দূর হতে পারে, তবে কতদিন এইভাবে থাকবে তা বলা কঠিন। নিরস্ত্রীকরণের অর্থ নৈতিক দিকও বিবেচ্য। যেমন, সমর-সজ্জা বাবদ বিভিন্ন দেশ বহু কোটি টাকা খরচ করে। বহু সামরিক বাহিনীতে কোটি কোটি লোক নিযুক্ত রয়েছে। সমর-সম্ভার উৎপাদন, রসদ সরবরাহ ইত্যাদি কাজও কয়েক কোটি লোক করে। অর্থাৎ, নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নের সঙ্গে বিশ্বের ৩৫ কোটি লোকের জীবিকা-সংগ্রহ ও ১২ হাজার কোটি টাকা মূলধন অন্য উপায়ে বিনিয়োগ করার ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হলে মানব-জাতির সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

উপনিষদে মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত ক'রতে দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে, কিন্তু মানুষ হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়েছে। বুদ্ধ একদিন অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তার ফল সুদূর প্রসারী হয়েছিল কি ? এই বিংশ শতাব্দীতে বর্ব্বরতার চরম প্রকাশ দেখে গান্ধীজী আবার ভারতে শাশ্বত অহিংসার বাণী প্রচার করলেন। পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণ বুদ্ধি যদি ব্যাপকভাবে মানুষের মনে প্রসারিত হয়, তাহলে হয়ত শান্তি স্থাপন করা সম্ভব। গান্ধীজী বারবার হিংসার পথ বর্জ্জন করতে বলেছেন। এছাড়া, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সহ-অবস্থান প্রভৃতির কথাও বর্ত্তমানে বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষের মনকে সংযত করতে না পারলে কিছুই হবে না। গান্ধীজী

মানুষকে সত্যাশ্রয়ী করে গড়ে তোলবার কথা বলেছেন। তাঁর বিশ্বাস এতে বিশ্বশান্তি সম্ভব। তিনি বলেছেন যে, একমাত্র অহিংসাকেই এ্যাটম্ বোমাও ধ্বংস করতে পারে না। "In its positive form, Ahimsa means the largest love, greatest charity. If I am a follower of Ahimsa, necessarily includes truth and fearlessness."—(Gandhiji)। গান্ধীজী এ্যাটম বোমার বিরুদ্ধে এই অহিংসার অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থা চালু থাকলে তৃতীয় বিশ্বসমরের আশঙ্কা থেকেই যাবে। এর ফল হবে এই যে, বিভিন্ন দেশ গোপনে বা প্রকাশ্যে অস্ত্র তৈরী করতে থাকবে। এতে বিশ্বশান্তি কোনদিন সম্ভব হবে না।

পরিশেষে বলতে পারা যায় যে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে যুদ্ধ করে হবে না। অহিংসার পথে অগ্রসর হ'তে হবে। ইহাই প্রকৃত ও একমাত্র পথ। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

আজ এই শিক্ষাই আমাদের নিতে হবে ও দিতে হবে। না হ'লে সমূহ ক্ষতির ভীষণ রূপ সামনে রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের সহায়তা করুক।
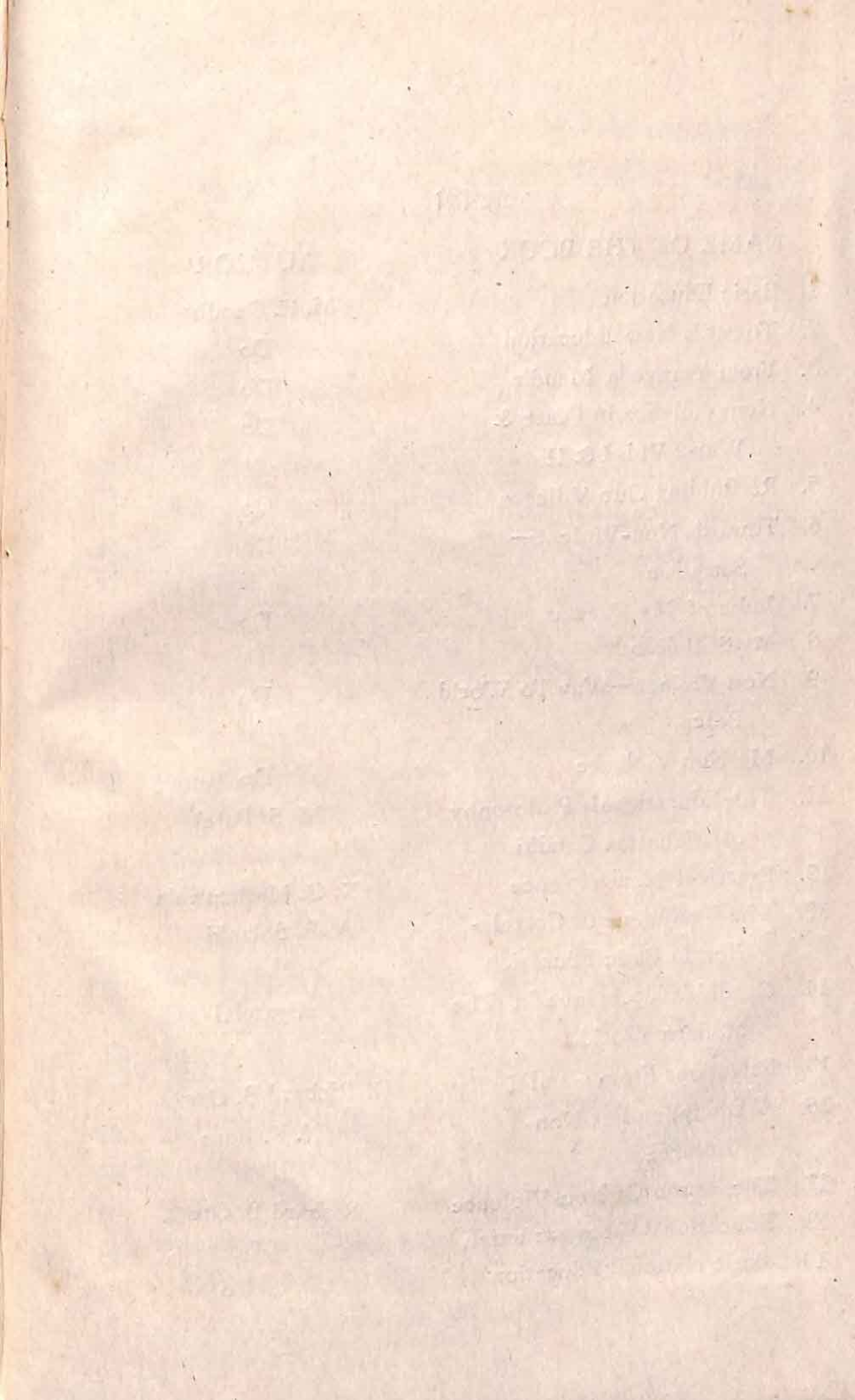
গ্রন্থপঞ্জী

	NAME OF THE BOOK	AUTHOR
1.	Basic Education	M. K. Gandhi
2.	Towards New Education	Do
3.	From Yeraveda Mandir	Do
4.	Non-Violence In Peace & War-2 Vols I & II	Do
5.	Re-Bulding Our Villages	Do
6.	Towards Non-Violent—Socialism	Do
7.	India of My Dreams	Do
8.	My Socialism	Do
9.	Non-Violent—Way To World Peace	Do
10.	My Non-Violence	Do
11.	The Educational Philosophy of Mahatma Gandhi	M. S. Patel
12.	Practical Non-Violence	K. G. Mashruwala
13.	The Technique of Correlation In Basic Education	A. B. Solanki
14.	Gandhian Technique In The Modern World	Pyarelal
15.	Selections From Gandhi	Richard B. Gregg
16.	A Discipline For Non-Violence	N. K. Bose
17.	The Power Of Non-Violence	Richard B. Gregg
18.	Educational Reconstruction	Do
19.	Basic National Education	Do

	NAME OF THE BOOK	AUTHOR
20.	One Step Forward	Richard B. Gregg
21.	Two years of Work	Do
22.	The Latest Fad Basic Education	J. B. Kripalani
23.	The New Education	Do
24.	All Men Are Brothers	Krishna Kripalani
25.	Schools of To-morrow	"
26.	The School And Society	John Dewey
27.	Domocracy and Education	Do
28.	Post-War Education	Zakir Huain
29.	Education of The Whole Man	L. P. Jacks
30.	Education and Social Order	Bertrand Russel
31.	The Wardha Scheme of Education	C. J. Varkey
32.	Post-War Development In India	Do
33.	Gandhian Outlook And	Do
	Techniques	Do
34.	Craft In Education	H. R. Bhatia
35.	Basic Education	B. G. Kher
36	The Gandhian Way	J. B. Kripalani
37.	Introducing The Basic Curriculum	K. G. Saiyidain
38.	The Wardha Scheme	K. L. Shrimali
39.	Gandhian Thought	J. B. Kripalani
40.	Mahatma Gandhi	Romain Rolland
41.	Visva Bharati Quarterly Education Number, 1947	

	NAME OF THE BOOK	AUTHOR
42.	Visva Bharati Quarterly— Gandhi Memoriol Peace Number	
43.	Mahatmaji & The Depressed Humanity	R. N. Tagore
44.	Studies In Gandhism	N. K. Bose
45.	সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ	বার্ট্রাণ্ড রাসেল
46.	বুনিয়াদী শিক্ষা	বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য
47.	শিক্ষা-বিচার	বিনোবা
48.	আমাদের জাতীয় শিক্ষা	চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী
49.	আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা	ক্ষেত্রপালদাস ঘোষ
50.	গান্ধীজী কি চান	নির্ম্মলকুমার বসু
51.	কাজের মাধ্যমে শিক্ষা	অমরনাথ রায়
52.	শিক্ষার ক্রমবিকাশ	মোহিতকুমার সেনগুপ্ত